

দুর্লভ 'দুর্লভ'
নারায়ণ সান্যাল

দুর্লভ 'দুর্লভ'

উৎসর্গ
পঞ্চাশোধর্ব-সঙ্গীতজ্ঞ
শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র
'কৃষ্ণনগরীয়ানেষু'

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

যে দুর্লভ প্রতিভার কথা লিখতে বসেছি, তাঁর কথা জানতে পেরেছিলাম নিতান্ত ঘটনাচক্রে। ফুলদি হঠাৎ টেলিফোনে জানালেন, তাঁর গুরুদেব আমাকে একদিন দেখা করতে বলেছেন।

ফুলদির বিয়ে হয়েছে সাঁড়াগাছির মৈত্রবাড়ি। ওঁর গুরুদেবকে অনেকবার দেখেছি। তিনি হচ্ছেন মৈত্রবাড়ির কুলপুরোহিত এবং অনেকেরই মন্ত্রগুরু। বেশ জাঁকিয়ে কালীপূজা হত মৈত্রবাড়িতে। এখনও হয়। ছেলেবেলায় বহুবীর 'কালীপূজা' দেখতে গিয়েছি, বলিদানের সময় তিনতলার চিলেকোঠায় দু-কান বন্ধ করে একটা আর্তনাদকে ঠেকাতে চেষ্টা করেছি, বিসর্জন পাড়ি দিয়ে একেবারে ভাইফোঁটা সেরে ফিরেছি! পূজা করতেন ফুলদির গুরুদেব—শ্রীপবনচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাই তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে আধুলির মাপে লাল-সিঁদুরের ফোঁটা, দশাসই দেহাবয়ব এবং নাটমন্দির-কাঁপানো দরাজ হাসি। যজ্ঞ-যাজন ছাড়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনও করতেন। উত্তর কলকাতার কোন একটি হাই স্কুলে নাকি সংস্কৃতের হেড-পণ্ডিত ছিলেন। ছেলেবেলায় রীতিমত ভয় করতাম তাঁকে—হয়তো তাঁর প্রকাণ্ড দেহের জন্য, নয়তো ঐ লাল-ফোঁটা, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি আমার মনে একটা ভীতির সঞ্চার করত। ক্রমশ বয়স বেড়েছে, বুঝতে শিখেছি—অতি অমায়িক মানুষ তিনি। ফুলদি যে-সময়ে টেলিফোন করে ঐ খবরটা আমাকে জানালেন সে সময়ে আমার মাথায় 'পাষণ্ড-পণ্ডিত' উপন্যাসটা বীজের আকারে অঙ্কুরিত হতে চাইছে। সংস্কৃতজ্ঞ প্রশান্ত পণ্ডিতকে ছেলেরা আড়ালে ডাকে 'পাষণ্ড পণ্ডিত'। ছেলেরা কেন, বড়রাও বুঝতে পারে না পাষণ্ড-পণ্ডিতের অস্তঃস্থলে ফল্লুধারার প্রবাহ। কাহিনীটা দানা বাঁধেনি, চরিত্রটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি; তাই ফুলদির টেলিফোন পেয়ে আর কালবিলম্ব করলাম না। সংস্কৃত পণ্ডিত মানুষটির একান্ত সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সুযোগটা হারাতে আমি রাজি নই। কেন তিনি আমার খোঁজ করছেন জানি না, পরের রবিবার সকালে গিয়ে হাজিরা দিলাম তাঁর শিবনারায়ণ দাস লেনের ভদ্রাসনে।

*

*

*

বৃদ্ধ একটি বালাপোষ জড়িয়ে আধাশোয়া হয়ে বসেছিলেন তাঁর ঘরজোড়া সাবেকি পালঙ্কে। আমাকে দেখতে পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন,—এই যে বাবাজী এসে গেছে! স্মরণমাত্রই উপস্থিত—এঁয়া? পিতৃদত্ত নামটা সার্থক! কী বল?

আমি বালাপোষের তলায় হাত চালিয়ে তখন ওঁর চরণ-যুগলের সন্ধান করছি।

—বস, বাবাজী, বস! ওরে—ওর জন্যে একটা চেয়ার নিয়ে আয়।

ওঁর ছেলে একটি চেয়ার নিয়ে আসে। হেসে বলে, ভাল আছেন তো? কী লিখছেন এখন?

ততক্ষণে পালঙ্কের নীচে রাখা একটি বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়েছি। বৃদ্ধ অনুযোগ করতে থাকেন, বুড়ো হয়ে পড়েছি বাবা, আজকাল আর ঘরের বার হই না বলতে গেলে। তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। তোমরাও কাজের মানুষ। তবে যে তুমি আহানমাত্র এসেছ, তাতেই—

আমি বাধা দিয়ে বলি, কী আশ্চর্য! আপনি ডাকলে সাড়া দেওয়াও তো একটা কাজ!

—তা তো বটেই, তা তো বটেই! স্বয়ং নারায়ণও ভক্তের ডাকে ছুটে আসেন, তুমি তো আসবেই—

বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্প হল। সেকালের কথা সব। আমি চোখের সামনে দেখছি, দশাসই চেহারার ভট্টাচার্য-মশাইকে, আর মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি বাজে-পোড়া রোগা একহারা তালঢাঙা পাষণ্ড-পণ্ডিতকে, যে পাষণ্ড-পণ্ডিত তখনও জন্মলাভ করেননি।

গল্পগুজবের ফাঁকে চা-মিস্ট্রান এল। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে শেষমেশ বললাম, এবার বলুন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

বৃদ্ধ বললেন, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে বাবা।

—বলুন। সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয় করব।

—আমার পিতৃব্য-মহাশয়ের এটা জন্ম-শতবর্ষ। তাঁর কয়েকজন শিষ্য ও ভক্ত মিলে এজন্য একটি স্মারক পুস্তিকা বার করবেন বলে স্থির করেছেন। তাতে তোমাকে একটা লেখা দিতে হবে।

একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলি, স্মারক-গ্রন্থে তো মামুলী গল্প-কবিতা মানাবে না—

উনি বাধা দিয়ে বলেন, না না, গল্প-কবিতা আমরা চাইছিও না। তাঁর সম্বন্ধেই দু-চার কথা লিখতে হবে আর কি।

অর্থাৎ ফরমায়েসী জীবনী! তিনি দয়ালু ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন, পিতা-মাতাকে যথারীতি ভক্তি করতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। বাঁধা ফর্মুলা। যাঁকে জানি না, চিনি না, নামটা পর্যন্ত শুনি নি তাঁর সম্বন্ধে ইনি—বিনি—পাতা দু-তিন লিখে ফেলতে হবে। সাল-তারিখ, পিতার নাম, জন্মস্থান ইত্যাদি তথ্য নিশ্চয়ই উনি সরবরাহ করবেন—শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিশ্চয় তাঁরও জীবিকা ছিল যাজন ও যাজন। শিষ্য ও ভক্তের উল্লেখ তো এইমাত্র শুনলাম, ফলে অনুমান করতে পারি তিনিও মন্ত্র-দীক্ষা দিতেন, গুরুগিরি করতেন। সত্য-মিথ্যার ভেজাল দিয়ে অমন একখানা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আন্দাজী জীবনী লেখা এমন কিছু কঠিন নয়—যে কোন কিশোর রচনা-সংকলন থেকে কয়েকটি নামধাম বদল করে কপি করার কাজ! অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম এককথায়! বললাম, ঠিক আছে। লিখে দেব। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু আপনার জানা আছে বলুন।

আমি খাতা-কলম বাগিয়ে বসি।

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ দেওয়ালে প্রলম্বিত প্রায়-খুঁসর-হয়ে যাওয়া একটি আলোকচিত্রের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। অনুমান করতে পারি, সে আলোকচিত্রটি ওঁর পূজাপাদ পিতৃব্যের। তারপর উনি বললেন, আমার খুঁদামশায়ের নাম 'দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য'। তাঁর আমলে তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য মাদঙ্গিক।

মাদঙ্গিক! হায় ঈশ্বর! যাজন-যাজন নয়? গুরুগিরি নয়? কালীপূজা নয়?

একটু অবাক হয়ে সেই প্রশ্নই করলাম : মাদঙ্গিক। মাদঙ্গিক মানে?

এইচ. ই-স্কুলের প্রাক্তন হেড পণ্ডিতমশাই একটিপ নস্য নিয়ে বললেন: মুদঙ্গ + ষিঙ্ক ইতি মাদঙ্গিক।

আমার বিশ্বাসের ঘোর তখনও কাটেনি। বলি, না মানে মুদঙ্গ...

—হ্যাঁ! মৃৎ ইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহুব্রীহি! মুদঙ্গ মানে—মুরজ, পাখোয়াজ, খোল আর কি!

আমি ফ্ল্যাট! ঢোক গিলে বলি, আশ্চর্য তা বুঝেছি। কিন্তু খোল-মুদঙ্গ তো বৈষ্ণবদের আখড়ায় পাওয়া যায়—আপনাদের ঘোর শাক্ত পরিবারে—

বৃদ্ধ বললেন, ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি। দুর্লভচন্দ্র তেমনই এক ব্যতিক্রম—রীতিমত দুর্লভ চরিত্র। তাঁর কাহিনীটা তোমাকে শোনাব বলেই ডেকে পাঠিয়েছি। উপরোখে তোমাকে টেকি গিলতে হবে না বাবাজী, তাঁর জীবনীটা বিস্তারিত শোন, তারপর যদি সত্যই উৎসাহিত বোধ কর—তাঁর কথা লিখবার জন্য অন্তর থেকে সত্যই কোন তাগিদ অনুভব করে তবেই লিখ। নচেৎ নয়!

এর পর দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কাছে বসে দুর্লভচন্দ্রের জীবনহিতাস শুনেছি। অভিভূত হয়েছি সে কাহিনী শুনে। খুঁটিয়ে জানবার চেষ্টা করেছি তাঁর কথা! নানান সূত্র থেকে।

দুই

আমি মার্গ-সঙ্গীত নিয়ে কোনো পড়াশুনা করিনি, ফলে শ্রুতিনির্ভর এ কাহিনীতে তথ্যগত ভুলত্রুটি থাকতে পারে, তবু সেই আশঙ্কায় পিছিয়ে আসাও ঠিক নয়। যাঁরা প্রকৃত অধিকারী তাঁরা হয়তো সে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে ভবিষ্যতে ওঁর এবং ওঁর কালের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করবেন। স্মারক-গ্রন্থে আমার লেখা চারপৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত জীবনীটাকে আজ আর বোধকরি খুঁজে পাওয়া যাবে না—হয়তো দুর্লভচন্দ্রের কোনও শিষ্য বা গুণগ্রাহীর সংগ্রহে সেই স্মারকগ্রন্থটির কোনও কপি খুঁজে

পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সেদিনের সেই নোট নেওয়া খাতাটা আমার কাছে আজও আছে। তা থেকেই সেই দুর্লভ চরিত্রটির একটা ঔপন্যাসিক রেখাচিত্র খাড়া করা যায়।

পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন অথবা মাতামহ কাশীনাথ তর্কবাচস্পতি—সদ্যোজাত শিশু-সন্তানের নামকরণটি কে করেছিলেন আজ আর তা জানবার উপায় নেই। অনেক অনেকদিন আগেকার কথা—একশ’ বছরেরও বেশি। বাঙলা ১২৭৮ সন, ইংরাজী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। শুক্রপক্ষের চন্দ্রকলার সঙ্গে ফাল্গুনী অমাবস্যা তিথিতে স্মার্তপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাচস্পতির ভদ্রাসনে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর নাম রাখা হল দুর্লভচন্দ্র। শতবর্ষের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে এ নামকরণটি যিনি করেছিলেন তাঁর ছিল অদ্ভুত দূরদর্শিতা। মেকি আর ভেজালের দুনিয়ায় একনিষ্ঠ সাধক দুর্লভচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সত্যিই দুর্লভ!

ওঁর আদি পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় সে-যুগের স্বনামধন্য নৈয়ায়িক হলধর ন্যায়রত্নের কথা। রাজসাহী অথবা যশোর থেকে তিনি যখন হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে চলে আসেন তখন কোম্পানীর আমল। সাঁত্রাগাছি গ্রামের তদানীন্তন জমিদার চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে ও অর্থানুকূলে হলধর সে গ্রামে একটি সীতারামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হলধর ছিলেন চৌধুরীদের কুলপুরোহিত। সেই সীতারামের পূজা আজ দেড়শ বছর ধরে চলে আসছে, এবং ঐ সীতারামের জন্যই অঞ্চলটির নাম রামরাজাতলা। হলধর ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধিতে—সান্যাল। পৌরোহিত্য করার জন্য ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করেন।

হলধরের তিন পুত্র—নন্দলাল, মতিলাল এবং যদুলাল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দলাল বিদ্যারত্ন কালে শ্বশুরমহাশয়ের শিবনারায়ণ দাস লেনের ভদ্রাসনে বাস করতে আসেন। শ্বশুর ছিলেন—আগেই বলেছি—কাশীনাথ তর্কবাচস্পতি। তিনি শীলস্ স্ত্রী স্কুলে—বর্তমানে যার নাম মতিলাল শীলস্ স্ত্রী স্কুল—হেড-পণ্ডিত ছিলেন। নন্দলাল বিদ্যারত্ন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই এবং জজ-পণ্ডিত ভরত শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা একাধিকবার করেছিলেন।

১৬’ শিবনারায়ণ দাস লেনে দুর্লভচন্দ্রের বাল্যকাল কেটেছে। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। শক্তির উপাসক ওঁরা। সাতপুরুষ ধরে যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন করে এসেছেন। নন্দলালের গৃহেই চতুষ্পাঠী ছিল—ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র ও বেদান্তের চর্চা হত। বৃহৎ পরিবার। দুর্লভচন্দ্রের ছয় ভাই এক বোন—দুর্লভ ছিলেন অষ্টমগর্ভের সর্বকনিষ্ঠ। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি—পিত্রালয়ই গুরুগৃহ—ফাঁকি দেওয়ার কোন ছিদ্রপথ নাই। ব্রাহ্মমূহর্তে শয্যাভ্যাগ করতে হত, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিত্য-জ্ঞানোদয়ের আয়োজন করতে হত সূর্যোদয়ের পূর্বেই। উপক্রমণিকার উপলব্ধির পথে হাঁটি-হাঁটি পা-পা। দুর্লভচন্দ্রের অগ্রজ পাঁচ ভাই এভাবেই একে একে সংস্কৃত পরীক্ষার সোপান অতিক্রম করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। মধ্যম ভাতা কৈলাশচন্দ্র তো ইতিমধ্যেই ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে পিতার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। নন্দলাল বলতেন, কৈলাশই আমার ছেলদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করবে। তা সত্য—পরবর্তীকালে কৈলাশচন্দ্র ‘বিদ্যাভূষণ’ হয়েছিলেন—উন্নীত হয়েছিলেন ডফ কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক পদে।

সুতরাং কনিষ্ঠপুত্র দুর্লভচন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতির কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। উপক্রমণিকার পরিখা-বেষ্টিত সংস্কৃত-দুর্গে দুর্লভচন্দ্রকে দুর্গাধিপ করতে চাইলেন নন্দলাল; কিন্তু ফল হল না বিশেষ। দেখা গেল, পাষণপ্রাচীরের ইন্দ্রকোষে চোখ লাগিয়ে দুর্লভচন্দ্র বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্নমশাই সংখেদে লক্ষ্য করলেন নীরস ব্যাকরণ-সূত্র কণ্ঠস্থ করার দিকে পুত্রের আগ্রহ কম—যদিও ধীশক্তিতে সে অন্য কোনো ছাত্রের চেয়ে কম যায় না। পুত্র যদি স্বভাবত মূর্খ হত তাহলে হয়তো সান্ত্বনা পেতেন নন্দলাল; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি পুরোমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও বিদ্যার্জনে তার অনীহা দেখে তিনি আরও ক্ষুব্ধ হতেন। অনেক চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, নাঃ! দুলিটার কিছু হবে না।

দুর্লভজননী ছিলেন অদূরে। বললেন, সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। ওর লেখাপড়া হবে কি না জানি না, কিন্তু আপনি দেখে নেবেন—দুলি আমার মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে একদিন।

স্মার্ত পণ্ডিত এ কথায় কোনও সান্ত্বনা পাননি। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের সন্তান, ব্যাকরণের প্রথম

ধাপটাত্তেই যদি সে হাঁচট খায় তখন তার সম্বন্ধে আর কিছু আশা করার যুক্তি খুঁজে পাননি তিনি। বলেছিলেন, ং সাত্ত্বনা নিয়েই থাক তুমি। আমার আর কোনো ভরসা নেই।

নন্দলাল দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু মায়ের ভবিষ্যৎবাণী ংকদিন বর্ণে বর্ণে সার্থক করেছিলেন সেদিনের সেই ছোট্ট দুলি। সারা দেশকে ংকদিন শিবা-পশুপতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল—‘বঙ্গালমূলুক মঁেঁ ভি হঁেঁ ংক উস্তাদ!’

*

*

*

দুর্লভচন্দ্রকে প্রথম যিনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর নাম মুরারীমোহন। তিনি ধরতে গেলে নন্দলালের প্রতিবেশী। পাশের গলি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতেন। সে আমলের বিখ্যাত মাদঙ্গিক মুরারীমোহন গুপ্ত। উপাধিতে ‘গুপ্ত’ হলেও প্রতিভায় তিনি ছিলেন স্বয়ং-প্রকাশ। ংকদিন ংসে উপস্থিত হলেন স্মার্ত পণ্ডিতের কাছে, নন্দলালের ভদ্রাসনে। বললেন, দাদা, দুলিটাকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন। ওর কান আছে, হাত আছে—ওর হবে!

ছোট্ট দুলির যে ংকজোড়া কান ংবং ংকজোড়া হাত আছে ংটা কোনো নতুন সংবাদ নয়, জন্মাবধি দেখে ংসছেন। তাই মুরারীমোহনের কথার তাৎপর্যটা ংক ধরতে পারলেন না নন্দলাল। বলেন, ংক বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ তুমি?

—দুলি রোজ গিয়ে বসে আমার সঙ্গীত শিক্ষার ংসরে। ংনেকেই তো ংসে, শিখতে ংসে—কিন্তু ওর মতো ংকজনকেও আমার নজরে পড়েনি। শুধু কান আর হাত নয়, ওর নিষ্ঠা আছে। ংপনি বিশ্বাস করুন, ংমি নিশ্চিত বলছি—ওর হবে।

‘ওর হবে’ ং কথার ংর্থ গ্রহণ হয় না নৈয়ায়িকের! তিনি শুধু বলেন, ং তুমি কী বলছ মুরারী? ংমার বংশের ছেলে—হলধর ন্যায়রত্নের বংশধর মৃদঙ্গ বাজাবে?

মুরারী হাত দুটি জোড় করে বলেছিলেন, ংঞ্জে হ্যাঁ, তাই বাজাবে—যদি ংপনি ংনুমতি করেন। রুখে ওঠেন স্মার্ত পণ্ডিত, কিন্তু কেন ংনুমতি দেব ংমি? মাদল বাজিয়ে কেন চতুর্বর্গ লাভ করবে সে? তুমি ংকটি উন্মাদ!

শাস্ত্র সমাহিত কণ্ঠে মুরারীমোহন যুক্তকরেই বলেছিলেন, ংও মহামায়ার ংক মায়া বিদ্যারত্নদা! যাকে ংপনি বলেন—‘ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা’! উন্মাদ? ংঞ্জে হ্যাঁ, ংমি উন্মাদ! ংমরা উন্মাদ! কিন্তু ভেবে দেখুন ংপনি—পরমহংসদেব কি উন্মাদ নন? বামাঙ্ক্যাপা উন্মাদ নন? তেমনি হরিদাস স্বামীও উন্মাদ, বৈজু বাওরা—বাওরা! ংপনি তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমে যাকে ধরতে চান, দুলি তাঁকেই মৃদঙ্গের বোলে ধরতে চায়। যত মত, তত পথ! ংমার যুক্তকর নিবেদন বিদ্যারত্নদাদা, ংপনি ওর সাধনায় বাধা দেবেন না।

গৃহবিগ্রহের দিকে ংকদৃষ্টে কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন সান্নিক পণ্ডিত। শেষে ংকটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। সম্বিত ফিরে পেলেন যেন। বললেন, তথাস্তু। দুলিকে তোমার হাতেই তুলে দিলাম।

তিন

আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মত মার্গ-সঙ্গীতও গুরুমুখী বিদ্যা। তাই দুর্লভচন্দ্রের কথা বলতে হলে তিনি যে ধারার ধারক সেই ধারাটিকে প্রথমে চিনে নিতে হবে। দুর্লভচন্দ্রের প্রসঙ্গে নেমে পড়ার ংগেই তাই তাঁর গুরু মুরারীমোহন ংবং সেই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের মৃদঙ্গ শিক্ষার ংদিগুরুদের সম্বন্ধে সামান্য ংলোচনা ংপরিহার্য হয়ে পড়ে :

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ ংলমের দরবারে সঙ্গীতচর্চা যখন রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল তখন ংষ্টদশ শতাব্দী শেষ হচ্ছে। দিল্লীর গৌরবরবি ংস্তমিত হওয়ার ংশঙ্কায় দিল্লী দরবারের স্নানামধ্য গায়কগুণীরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লেন—বিভিন্ন সামন্তরাজদের দরবারে ংশ্রয় খুঁজতে থাকেন তাঁরা। তানসেন বংশীয়েরা ংলেন পূর্বদিকে—কাশী, বেতিয়া,—রেওয়ার রাজা কিংবা ংযোধ্যার নবাবের দরবারে ংশ্রয় পেলেন কেউ কেউ। ংবার কয়েকজন সঙ্গীতসাধক চলে ংলেন ংরও পূর্বদিকে—বঙ্গদেশে।

এই পূর্বাভিমুখী সঙ্গীতাচার্যদের বলা হয় ‘পূর্ববীয়া’; যেমন তানসেন শিষ্যবংশীয়, যাঁরা রওনা দিয়েছিলেন রাজপুতানার দিকে, পশ্চিমে, তাঁদের বলি ‘পছাওয়ালা’। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও দেখছি দিল্লীর বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ আসছেন পূর্বাঞ্চলের ধনকুবেরদের আশ্রয়ে, কলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, বর্ধমানে। এই সময়েই বিষ্ণুপুরে এসে হাজির হলেন তানসেন-ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া উস্তাদ বাহাদুর খাঁ। তাঁর সঙ্গী ছিলেন পাখোয়াজী পীরবক্স। বাহাদুর খাঁকে ঘিরে বিষ্ণুপুরে শুরু হল সঙ্গীতচর্চা। সেই বিষ্ণুপুর ঘরানার আদিগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই, বৃন্দাবন প্রভৃতিও এই ঘরানায় প্রথম যুগের সঙ্গীতাচার্য।

একদিন ধ্রুপদ গানকেই একমাত্র শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত বলে মনে করা হত। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম, প্রকৃতির বন্দনা এবং রাজার মহিমাকীর্তন। ধ্রুপদের বাঁধুনি আর রাগবিস্তারের পদ্ধতি খুব সুসংবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট। শাস্ত্র গভীর রসের ধ্রুপদ সঙ্গীতে চলত তার স্থান নেই—সে যেন গজেন্দ্রগমন—মীড়, গমক, আশ্রয়ের ব্যবহার থাকতে পারে, তানের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই মার্গ-সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল নানা কারণে।

আত্মসংযম ও নিষ্ঠার অভাবে সঙ্গীতকে সহজতর করবার প্রচেষ্টায় কেউ কেউ খেয়াল-জাতীয় গানের দিকে ঝুঁকলেন, কেউ খেয়ালের বৈশিষ্ট্যটুকুও বজায় রাখতে অসম্মত হয়ে নামলেন ঠুংরীর চর্চায়। ‘নামলেন’ শব্দটা আমি অবশ্য কোনো কদর্থে ব্যবহার করতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি—যাঁর কণ্ঠে অজ্ঞান তান আছে, স্বরকম্পনে যিনি পারদর্শী, তিনি ধ্রুপদ-ধামারের ছন্দবদ্ধ ধরা-বাঁধা নিয়ম মেনে খুশি থাকবেন কেন? বিশেষ, শ্রোতা যদি চটুলতর সঙ্গীতই শুনতে চায়। জেট-যুগে গজেন্দ্রগমনের তারিফ না হলে কাকে দুষব? তা সে যাই হোক, তবু বিষ্ণুপুরের একদল সঙ্গীতসাধক যে দীর্ঘদিন ধরে নির্ভেজাল ধ্রুপদী সঙ্গীতকে সংকীর্ণ ভূখণ্ডে জীবিত রাখতে পেরেছিলেন একথা অনস্বীকার্য।

না। শুধু বিষ্ণুপুর নয়। বিষ্ণুপুর ঘরানার সমান্তরালে উত্তর কলকাতায় প্রায় সমসময়েই তিল তিল করে গড়ে উঠছিল আর একটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদী-ঘরানা, মূলত বাগবাজার এবং ঠনঠনিয়া অঞ্চলের কয়েকজন লক্ষ্যপতির পৃষ্ঠপোষকতায়। মার্গ-সঙ্গীতের পূর্ণ ইতিহাস আমরা এখানে আলোচনা করতে বসিনি—তাই একটিমাত্র উদাহরণই দেব—যে উদাহরণ আমাদের পৌঁছে দেবে আমাদের আলোচ্য চরিত্র দুর্লভচন্দ্রে। ঠনঠনিয়ার জমিদার দুই ভাই ছিলেন নিমাই চক্রবর্তী এবং শ্রীরাম চক্রবর্তী। শুধু সরস্বতী নন, লক্ষ্মীদেবীরও অকুপণ আশীর্বাদ ছিল দুই ভাইয়ের উপর। দুজনেই সঙ্গীতপাগল। পশ্চিমাগত বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক লালা কেবল-কিষণকে গুরুত্ব বরণ করে এই দুই ভাই ঠনঠনিয়াতে খুলে বসলেন এক মার্গ-সঙ্গীত চর্চার আসর। সারা কলকাতার যাবতীয় বিখ্যাত ধ্রুপদীয়ার সমাগম ঘটত চক্রবর্তী ভাতৃদ্বয়ের আবাসে। নূতন শিক্ষানবিশদের ওঁরা দুই ভাই বিনা পারিশ্রমিকে মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষা দিতেন। এখানেই তাঁরা ক্রমে লক্ষ্য করলেন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পিছনে ফেলে একজন নিরলস সাধক দ্রুত ব্যুৎপত্তি লাভ করে চলেছেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অক্ষশাস্ত্রের একজন তরুণ শিক্ষক। নাম মুরারীমোহন গুপ্ত।

আশ্চর্য চরিত্র। পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সেখানে ওভারসিয়ারি পরীক্ষার শেষ সোপান অতিক্রম করে রীতিমতো ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। শ্রীরামপুর জরীপ কলেজে চাকরি করতে করতে সাব-এঞ্জিনিয়ার পদেও উন্নীত হলেন। কিন্তু কাঁটা-কম্পাস মাপ-জোখ ওঁর ভাল লাগে না। রেঞ্জিং-রড-এর চেয়ে বাঁশের বাঁশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ওঁর ভাল লাগে, থিওডোলাইটের চেয়ে মৃদঙ্গটা আপন করে নিতে ইচ্ছে হয়। সে আমলে এঞ্জিনিয়ারিং চাকুরি ছিল—যাকে বলে হাতের লক্ষ্মী! কিন্তু এ! লক্ষ্মী ধরা দিতে এলেন কিন্তু ধরা দিলেন না মুরারীমোহন। উনি তখন আকুল হয়ে বনে বনে ফিরছেন—“কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!”

শেষ পর্যন্ত এঞ্জিনিয়ারিং চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সঙ্গীত-সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। মার্গ-সঙ্গীতের অতলে ডুব দিলেন অরুণপরতনের অশ্রেষণে। শিক্ষা সমাপন করে এসে বসলেন নিজের ভদ্রাসনে—সেই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের পৈত্রিক আবাসে।

রাস্তাটার নাম সার্থক করবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় নয়—কিন্তু প্রকারান্তরে যেন সেই উদ্দেশ্যই দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে শুরু করল : গুরুর প্রসাদী পেতে! দিবারাত্র সেখানে আলাপ চলত।

পুরবী থেকে রামকেলী, ভৈরবী থেকে ইমন। এখানেই এসে বসতেন দুর্লভচন্দ্র কিশোর বয়স থেকে। পিতৃগৃহের গুরুগৃহ নয়। এইটিই তাঁর সত্যিকারের গুরুগৃহ।

পরিণত বয়সে মুরারীমোহন যখন সাধনোচিত ধামে যাত্রা করলেন তখন বিংশ শতাব্দীর বয়স মাত্র চার বৎসর। গুপ্তমশায়ের শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁরা উত্তরকালে স্বনামধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপালচন্দ্র মল্লিক, সত্যচরণ গুপ্ত, তারকনাথ বসু, নিবারণচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নাম মনে আসছে। গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং লালচাঁদ বড়াল দীর্ঘদিন এ আসরে এসে সঙ্গীতচর্চা করেছেন। আর মনে পড়ছে শিবনারায়ণ দাস লেনের দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম। ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিলীয়মান ধারাটিকে যাঁরা ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে এক শতাব্দীর প্রান্ত থেকে অন্য শতাব্দীর সীমান্তে পৌঁছে দিলেন এঁরা সেই সাধকমণ্ডলী। অনবধানতায় হয়তো আরও কোন দিকপালের নাম উল্লেখ করতে ভুলেছি—তবু এঁরা সকলেই আমাদের নমস্য।

*

*

*

দুর্লভ ছিলেন মুরারীমোহনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। ছাত্রকে তিনি সঙ্গীতের কারিগরী বিদ্যাটুকুই শেখাতেন না, বলতেন—সঙ্গীত হচ্ছে একটা মাধ্যম। অধরাকে ধরবার একটা অবলম্বন। চরম লক্ষ্য হচ্ছে রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে তাঁকে পেতে হবে, তাঁতেই লীন হতে হবে। তাই সঙ্গীতসাধককেও হতে হবে সন্ন্যাসীর মত নিরাসক্ত, পবিত্র। শিষ্য হয়তো বলতেন, কিন্তু আপনিই তো বলেছেন—ধ্রুপদ সঙ্গীতের লক্ষ্য হল তিনটি—ধর্ম, প্রকৃতির বন্দনা এবং রাজার মহিমা কীর্তন।

গুরু বলতেন, না। মার্গ-সঙ্গীতের একটিমাত্র লক্ষ্য—এ সুরলক্ষ্মী! আর সব বাহ্য—উপাস্য একমাত্র তিনিই। প্রকৃতির মধ্যে অপরূপাকে রূপ পরিগ্রহ করতে দেখি, তাই প্রকৃতির গান গাই। ‘একবর্ণা’ যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে ‘বহুধা’ হয়েছেন— তাই ‘ভৈরো’য় শুনি প্রকৃতির প্রথম জাগরণ—কাকলি, ‘ভৈরবী’তে শুনি অসীমের চিরবিরহ বেদনা, ‘মূলতানে’ পাই রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের শান্ত নিঃশ্বাস, ‘পুরবী’তে শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। এই যে বিভিন্ন অনুভূতি এর মূলে কিন্তু সেই—‘একবর্ণা’!

কিশোর ছাত্র কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, বলতেন—কিন্তু রাজা! তাঁর মহিমা কীর্তন কেন?

—তিনি আমার নিয়োগকর্তা। সুরলক্ষ্মীকে লাভ করবার যে অভিসার তিনি তার পাথেয় যোগাচ্ছেন বলে। যজ্ঞমান যেমন যাজককে নিয়োগ করে তিনি তেমনি আমাকে নিয়োগ করেছেন বলে। তাঁর গুণগান করে তাঁর মনোরঞ্জন করি শুধু এই আশায় যে, তিনি সুরের তরণী বেয়ে গায়কের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অধরাকে ধরতে বার হবেন। যেমন ‘কানাড়া’ চলে ঘনাক্ষকারে বিশ্বুতপথ অভিসারিকার মত! সঙ্গীত-সাধনা তো অস্তেবাসীর একান্ত সাধনা নয়—এখানে যে যোগের পথে, মিলনের পথে, হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হয়—যেমন চলে বীণাকারের সঙ্গে মাদঙ্গিক! যে যজ্ঞমান শুধু স্তাবকশিল্পীর সন্ধান করেন—যত বড় রাজা-মহারাজাই হোন, তাঁকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে যাবে দুলি!

মৃত্যুর বছর দশ-পনেরো আগের কথা। অর্থাৎ অঙ্কের হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। একদিন মধ্যরাতে মুরারীমোহন এসে কড়া নাড়লেন শিষ্যের বাড়িতে। মধ্যরাত্রি নয়, প্রায় শেষরাত্রি। বিদ্যারত্নমশাই সদর দরজা খুলে দিয়ে দেখেন, শেষরাতে গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছেন মুরারীমোহন। উদাসীন আনমনা।

—কী ব্যাপার মুরারী? এত রাতে?

—দুলিকে একটু ডেকে দিন না দাদা।

ডাকবার প্রয়োজন হল না। শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তরুণ দুর্লভচন্দ্রের। বছর আঠারো-বিশ তখন তাঁর। উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন বাপের পিছনে। খালিগায়ে কোঁচার খুঁট জড়ানো। সেখান থেকেই বলে ওঠেন, কী হয়েছে? ডাকছেন কেন?

—তুমি একবার আমার বাড়িতে এস তো দুলি।

কেন, কী বৃত্তান্ত প্রশ্ন করলেন না শিষ্য। যেমন ছিলেন নেমে এলেন পথে। নন্দলাল বলেন, কোণো বিপদ-টিপদ হয়নি তো?

—আজ্ঞে না। আপনি আবার শুয়ে পড়ুন।

গুরুর পেছন পেছন দুর্লভ এসে উপস্থিত হলেন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে। মুরারীমোহন

তাল খুলে ঘরে ঢুকলেন। লঠনটা উসকে দিলেন। কাঁধের শালটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসলেন মাদুরে। বললেন, মৃদঙ্গটা হাতে নেওতো একবার। বাজাও।

দুর্লভের কাছে শেষরাত্রের এই প্রস্তাবটি অসংযত মনে হল না একতিল। আদেশমাত্র পাখোয়াজটি কোলে তুলে নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। কিন্তু মুরারীমোহন গান শুরু করতেই চমকে উঠলেন তিনি। হিন্দী নয়, ব্রজবুলি নয়, সংস্কৃত নয়—অতি পরিচিত বাঙলা ভাষা! অথচ গানটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদ! বাহার রাগ। তেওরা তাল। মুরারীমোহন একটুকরো কাগজ দেখে গাইতে থাকেন :

আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ

তোমারি সুগন্ধ হে।

কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,

চাহি তোমারি পানে আনন্দে হে।।

জুলে তোমার আলোক দুলোকভুলোকে

গগন-উৎসবপ্রাঙ্গণে

চিরজ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা,

আঁখি পাইছে অন্ধ হে।।.....

গানটি শেষ করে মুরারীমোহন বললেন, কী দুলি? এ গান আগে কখনও শুনেছ?

—আজ্ঞে শুনেছি। বছর শুনেনি, কিন্তু এ ভাষায় নয়! মার্গ-সঙ্গীত যে এমন সাদা বাঙলায় গাওয়া সম্ভব না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।

মুরারীমোহন বললেন, আমার ধারণাটা ঠিক উণ্টোরকম ছিল। আমার কেবলই মনে হয়, হিন্দী কেন? কেন নয় আমার মাতৃভাষা? তোমাকে কি বলব দুলি—কতবার কত হিন্দী গানকে বাঙলায় অনুবাদ করে গাইবার চেষ্টা করেছি—জুং পাইনি। কেমন যেন সব মিথিয়ে যায়! ভাষায় কেমন যেন হোঁচট খেতে হয়। শেষমেশ আমি ধরে নিয়েছিলাম—ওটা হবার নয়। হরিদাস স্বামী, তানসেন, যদু ভট্ট, বৈজু বাওরা যে ভাষায় গেয়ে গেছেন সে-ভাষা ছাড়া ধ্রুপদ-ধামার গাওয়া যায় না। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ যেমন দেবভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করে পড়লে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু আজ, জানলে দুলি, আজ এই বাঙলা গানখানি শুনে আমার ধারণাটা পালটে গেল। শুধু সে ধারণাটুকুই নয়,—আজ আরও একটা অন্ধ-বিশ্বাস আমার ভেঙে গিয়েছে!

—সেটা কী?—জানতে চাইলেন দুর্লভচন্দ্র।

—আমার এতদিন ধারণা ছিল—কথা হচ্ছে সঙ্গীতের শুধুমাত্র সোপান। একটা অবলম্বন। মিছরির ভেতরকার ঐ সূত্রটির মত। সূত্রটা খাদ্য নয়, কিন্তু গুটা না থাকলে মিছরিটা দানা বেঁধে ওঠে না। তেমনি দু-চারটি শব্দ ছাড়া সঙ্গীতসাধনা অসম্ভব। সে শব্দ অর্থবহ হোক বা না হোক। কিন্তু এই গানখানি শুনে আমার সেই ধারণাটাও পালটে গেল। মনে হল ‘কথা’ সঙ্গীতের অবলম্বন নয়, তার ‘দোসর’—যেমন বীণার দোসর হচ্ছে মৃদঙ্গ। বাগর্থ সংপৃক্ত হলে সে সুরের সহায়কই হবে, অন্তরায় নয়। এই একটিমাত্র বাঙলা গান আজ আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল।

—কোথায় শুনলেন এ গান?

—জোড়াসাঁকোয়। ঠাকুরবাড়িতে। কিন্তু গানটাকে চিনতে পেরেছ?

—কেন পারব না? এ তো অতি পরিচিত ‘আজু বহত সুগন্ধ পবন’! কিন্তু কে বাঙলা গানটা রচনা করেছেন?

—নাম বললে চিনবে? রবিবাবু। মানে রবি ঠাকুর। নাম শুনেছ?

—না। কে তিনি?

—প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি। তোমার চেয়ে বছর-দশেকের বড়ই হবেন। কী সুললিত কণ্ঠ! কিন্তু আমি বেশি মুগ্ধ হয়েছি তাঁর এই আবিষ্কারে। আমার মনে হচ্ছে এবার যুগান্তর আসছে দুলি। এবার থেকে সাদা বাঙলায় আমরা বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত গাইতে পারব। শুধু ঐটুকুই নয়, রবিবাবু গানটি পরিবেশন করবার আগে এ বিষয়ে দু-চার কথা বললেন। সব কথা ঠিক ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁর মোদ্দা কথাটা ছিল “হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্য, ওস্তাদী করবার জন্য নয়। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি—কিন্তু বাঙালীর ঘরে সে

তো আতিথ্য দিতে আসবে না, সে নিজেকে দেবে—নইলে উভয়ের মিলন হবে না। আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল; অর্থাৎ সৃষ্টির দিক থেকে।”

শিষ্য বললেন, ঠিক কী বলতে চাইছেন? ‘সে নিজেকে দেবে—নইলে উভয়ের মিলন হবে না’—এ কথার মানে কী?

—একটা তুলনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি—মনে কর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পুরুষ, বাঙালী প্রকৃতি। এক্ষেত্রে সঙ্গীতের মিলনোৎসবে এরা যদি পরস্পরে একাত্ম হয়ে যায় তবেই সৃষ্টি হবে নূতন সঙ্গীতসত্তা—সে না বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী, না বিশুদ্ধ বাঙালী—সে সে! ঠিক অনুরূপ ব্যাপারটি ঘটে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে। সঙ্গীত তখনই সার্থক যখন শ্রোতা এবং গায়ক তাদের বাস্তবসত্তাকে হারিয়ে সঙ্গীতের মিলনরাজ্যে একাত্ম হয়ে যায়—পুরুষ ও প্রকৃতির মত!

চার

পাঠক আমাদের মাপ করবেন। প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ে গেল অনেক অনেকদিন আগে শোনা একটি কাহিনী। পরের পিতৃব্যের কাহিনী শোনাতে বসে তাই হঠাৎ নিজের পিতৃব্যের প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। আশা করি এ খণ্ড-কাহিনীর ভেতর দিয়েই মুরারীমোহনের ঐ উপদেশটির তাৎপর্য বোঝা যাবে।

যাঁর কথা বলছি তিনি আমার আত্মীয়, পরম-আত্মীয়! ঈশ্বরেচ্ছায় সেই অশীতিপর সঙ্গীতকেশরী আজও ধরাধামে আছেন—ভগবান করুন সুস্থ শরীরে আরও দীর্ঘদিন তিনি আমাদেরই মধ্যে থাকুন। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তাঁর কাছে শোনা কাহিনীটির মূল কাঠামো বজায় রেখে এখানে লিপিবদ্ধ করছি। বিশেষ কারণে নাম-ধাম, পাত্র-পাত্রীকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম।

মনে করুন, আমার এ খণ্ডকাহিনীর নায়কের নাম অমৃতনাথ সান্যাল। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা—তখন তিনি ত্রিশ-বছরের যুবা পুরুষ। কিন্তু ঐ বয়সেই সঙ্গীতসমাজে তিনি প্রতিষ্ঠিত। গায়ক বা বাদক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়। বস্তুত সঙ্গীতরস পরিবেশনে তাঁর যতটা খ্যাতি তার চেয়ে সমঝদার হিসাবে তাঁর খ্যাতি বেশি। সঙ্গীত তাঁর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বতঃস্ফূর্ত!

যে অর্থে হরিদাস স্বামীর শিষ্য বৈজ্ঞান্যপ্রসাদ হচ্ছেন ‘বাওরা’ সে অর্থে কৃষ্ণনগরবাসী আমার খুল্লতাতও উন্মাদ। সারা ভারত পরিক্রমা করেছেন সঙ্গীত-সাধকদের জানতে, চিনতে, শুনতে, বুঝতে। কোথায় কোন প্রাপ্তে কে একটি নূতন তান, একটি নূতন বাট সংযোজিত করেছেন অমৃতনাথ তা স্বকর্ণে শুনতে ছুটতেন। এমনি ভাবে একবার তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন—ধরুন, বেতিয়ায়। উঠেছেন একজন সঙ্গীতজ্ঞের বাড়িতে—মনে করা যাক মনোহরবাবুর ভদ্রাসনে। মুখে মুখে খবর রটে গেল মনোহরবাবুর বাড়িতে এসে ডেরা-ডাঙা গেড়েছেন অমৃতনাথ। এখানে-ওখানে রোজই আসর বসে। মনোহর তাঁর অতিথিবন্ধুকে নিয়ে হাজিরা দেন সঙ্গীত আসরে। এভাবেই কেটে গেল প্রায় দিন পনেরো।

তারপর একদিন। মনোহরবাবুর এক বন্ধু তেওয়ারীজী বললেন, বাবুজী, আপনি মীনাবাইয়ের গান শুনেছেন কখনও?

—কোন মীনাবাই? গান শুনিনি, তবে নাম শুনেছি এক মীনাবাই—এর। এই বেতিয়ারই গায়িকা—তবে শুনেছি আজকাল আর গান করেন না তিনি।

—ঠিকই শুনেছেন। আজকাল আর তিনি গান করেন না। অন্তত গত দশ বছরের ভেতর তিনি কোথাও মুজরো নেননি। অন্ধ হয়ে যাবার পর।

—অন্ধ হয়ে গিয়েছেন? তা তো জানতাম না।

—হ্যাঁ। স্টোভ বাস্ট করেছিল। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু মুখখানা নাকি বীভৎস হয়ে গেছে তাঁর। আজকাল আর তাই লোকসমাজে বের হতেই চান না। প্রকাশ্যে গানও করেন না।

অমৃতনাথ একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন, অতি দুঃখের কথা। আমারও দুর্ভাগ্য! এখানে এসেই মনোহরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মীনাবাই—এর কথা! ইচ্ছা ছিল, তাঁর একটি ভজন শুনে যাব। কিন্তু হল না।

মনোহর বললেন, না। উনি আর আসরে আসেনই না। রাজার ব্যবস্থা করা মাসোহারা আছে। তাতেই কোনোক্রমে চলে যায়।

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল অমৃতনাথের।

কিন্তু দিনতিনেক পরেই ফিরে এলেন তেওয়ারীজী। বললেন, সান্যালমশাই, আপনার ভাগ্য ভাল। সেদিন আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল কোনো সূত্রে তা মীনাবাঈজীর কর্ণগোচর হয়েছে। শুনে তিনি বললেন, অমৃতনাথ আমার গান শুনতে চেয়েছেন, সে তো আমার সৌভাগ্য। বাইরের লোকের সামনে বের হই না বলে কি ঘরের লোকের সামনেও এ পোড়া মুখখানা বার করব না!

অমৃতনাথের চোখে জল এসে যায়। অচেনা অদেখা অমৃতনাথকে বাঈজী ঘরের লোক বলেছেন—আত্মীয়তা কি রক্তের? আত্মীয়তা ‘রাগ’-এর, অনুরাগের।

—বাবুজী! মীনাবাঈ তাঁর গরীবখানায় আগামী পরশু সন্ধ্যায় আপনাকে পদধূলি দিতে বলেছেন। আরও গুটি আট-দশ সঙ্গীতদরদীকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন। এই বোধহয় তাঁর শেষ প্রকাশ্য আসর।

মনোহর বলেন, তা কেমন করে হয়? অমৃতবাবু যে কাল সন্ধ্যার মেলে ফিরে যাচ্ছেন। টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

অমৃতনাথ বললেন, না। আমি যাব গান শুনতে। টিকিট ফেরত দিতে হবে।

মনোহর বিস্মিত হয়ে বলেন, কিন্তু আপনি যে বললেন কলকাতায় কী একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

অমৃতনাথ হেসে বলেছিলেন, তা আছে! কিন্তু সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ‘বাইরের লোকের’ সঙ্গে, তাই বলে কি ঘরের লোকের ডাক শুনে ছুটে যাব না?

*

*

*

বেতিয়া জনপদের গ্রামপ্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ি। তারই বৈঠকখানায় আসর বসেছে। ছোট্ট ঘর। দশ-বারো জন মানুষের ঠাই হয় কি না হয়। অমৃতনাথকে সসম্মানে নিয়ে গিয়ে আসরের সামনে এনে বসালেন তেওয়ারীজী। তাঁর সঙ্গে মীনাবাঈ-এর দীর্ঘদিনের জান-পহ্‌ছান। অমৃতনাথ বুঝতে পারেন, তেওয়ারীজীর মাধ্যমেই বাঈজী সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি ওঁর গান শুনতে ইচ্ছুক। সে যাই হোক, একটু পরে পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন মীনাবাঈ। শিউরে উঠলেন সবাই। যাঁরা ঐ বাঈজীকে আগে দেখেছেন তাঁরা মনে মনে ‘হায় হায়’ করে ওঠেন। এককালে সুন্দরী হিসাবে খ্যাতি ছিল মীনাবাঈজীর—সেই মুখখানা এখন কী ভীতংস হয়ে গিয়েছে! মাথা নামিয়ে বাঈজী সকলকে আদাব জানিয়ে বললেন, আপুঁ কাঁহা হাঁয়?

বাঈজী অমৃতনাথের চেয়ে বছরপাঁচেকের ছোটই হবেন—পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে তাঁর। বাহুল্যবর্জিত সজ্জা—রাজস্থানী ঢঙে পরা! দৃঢ়নিবদ্ধ কাঁচুলি ও ঘাগরা এবং ওড়না। অমৃতনাথ বুঝে উঠতে পারেননা বাঈজী কাকে খুঁজছেন। কিন্তু ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন তেওয়ারীজী। বাঈজীর হাতখানি তুলে নিয়ে অমৃতনাথের বাহুতে স্পর্শ করান। বাঈজীর সেই দৃষ্টিহীন হাতখানি ওঁর বাহুমূল বেয়ে নেমে এল হাঁটুতে, পায়ে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল ওঁকে। কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন অমৃতনাথ। বাঈজী বললে, আপুঁ মুঝকো আশীর্বাদ নহীঁ কিয়া ক্যা পণ্ডিতজী?

অমৃতনাথ সংক্ষেপে বললেন, করেছি। মনে মনে।

—ক্যা প্রার্থনা কিয়া মুঝকো লিয়ে? দীর্ঘ জীবন?

—না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি তোমার সাধনা যাতে সিদ্ধিলাভ করে।

বাঈজী একমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। তারপর বসল নিজের আসনে। সারেসী-বাদক তুলে নিল তার যন্ত্রটা। তবলচি হাতুড়িটা তুলে নিয়ে ঠুকঠাক শুরু করল।

তারপর দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। বাঈজী শুরু করল গহরজানের একটি ঠুংরি, খান্বাজে—

“তনমন কী সুধ বিসর গঈ

কৈসী বজাইরে বাঁসরিয়া

জবসে ভনক শুনি কানন মৈঁ
তব সে নীদ নহীঁ মেরে নৈনু মৈঁ
কহে গহর পিয়ারী মন তু ন লীজিয়ে
মুরলী কী ধুন শুনি বাওরিয়া।.....”

অমৃতনাথ তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। ভুলে গিয়েছেন—কোথায় বসে, কার গান শুনছিলেন, তাঁর মনে হল বাঁস্জী নয়, এ শ্রীরাধিকার আর্তি। “আমি তনুমনের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এ কেমন করে বাঁশী বাজালে তুমি! যখন থেকে তোমার বংশীধ্বনি শুনলাম তখন থেকে আমার আঁখিপাতে আর নিদ্রা আসে না। গহর বলছেন, মুরলী শুনে তো উন্মাদিনী হয়েই রয়েছি, আর এ পাগলীর মনকে নিয়ে কী করবে?” তাঁর মনে হল—বুঝি তিনি নিজেই বাঁশী বাজিয়ে ঐ সঙ্গীতজ্ঞাকে উতলা করে তুলেছেন। ওঁর মুরলীধ্বনি শুনে ঐ শ্রীরাধিকা তনুমনের বোধশক্তির কথা ভুলে গিয়েছে, সে বাওরিয়া হয়ে গিয়েছে। উন্মাদিনীর মতো অব্যবধারে কাঁদছে।

চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে কারও খেয়াল নেই। সেই মারাত্মক দুর্ঘটনার পর—গত দশ বছর ধরে মীনাবাঈ এমন প্রকাশ্য আসরে গান গায়নি; দশ বৎসরের পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-রসধারা আজ রাত্রে যেন লকগেটের বাঁধ ভেঙে উচ্ছলধারায় বয়ে চলেছে। সমস্ত আসর বৃন্দ হয়ে গিয়েছে। মধ্যরাত্রে সঙ্গীত শেষ করলেন মীনাবাঈ। সারা আসর ‘হায় হায়’ করে উঠল। মীনাবাঈ তার অন্ধ দুটি দৃষ্টি সামনের দিকে মেলে প্রশ্ন করল, ক্যা পণ্ডিতজী? আপুঁ কিছু নহীঁ বোলা?

সকলেরই দৃষ্টি গেল সেদিকে। অমৃতনাথ যেখানে বসেছিলেন সে স্থানটা শূন্য। সকলে যখন সঙ্গীতরসে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞানহীন, তখন নিঃশব্দে তিনি উঠে চলে গিয়েছেন। ব্যাপারটা বিশ্বাস হল না কারও! একটু এদিক-ওদিক খোঁজখবরও করা হল—কিন্তু না, অমৃতনাথের জুতোজোড়াও নেই—দরজার পাশে হেলান দিয়ে রাখা ছিল যে শৌখীন হাতির দাঁতের মুঠওয়াল ছড়িটা সেটাও অন্তর্হিত। ক্ষুদ্ধ হল সবাই অমৃতনাথের অসৌজন্যে—নিমন্ত্রিত অতিথি তিনি; বস্তুত তাঁকে উপলক্ষ্য করেই এ আসরের আয়োজন। এ ক্ষেত্রে গৃহস্বামিনীকে কোন কিছু না বলে এভাবে নীরবে তাঁর স্থানত্যাগ রুচিবিগর্হিত। মনোহর এবং তেওয়ারীজী অমৃতনাথের হয়ে বারে বারে গৃহস্বামিনীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে থাকেন।

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না মীনাবাঈ। যত বড়ই সঙ্গীতাচার্য হোন না কেন, এভাবে কেন তিনি অপমান করলেন বাঁস্জীকে? যদি তাঁর ভাল নাই লেগে থাকে তাহলেও তাঁর উচিত ছিল সৌজন্যের নির্দেশে আসর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মীনাবাঈ বলে, নহীঁ জী! ম্যায় নেহি মানলি। টাঙ্গা বোলাইয়ে—ম্যায় খুদ যাউঙ্গি পণ্ডিতজীকো পাস। মুঝে সমঝনা চাহিয়ে কি কেঁও পণ্ডিতজীনে—

ওঁরা বারে বারে বোঝাতে থাকেন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। এত রাত্রে কী হবে অতটা ধাওয়া করে! কাল সারাদিন তো অমৃতনাথ আছেন বেতিয়াতে, সন্ধ্যায় ট্রেন ধরবেন—এ ক্ষেত্রে কাল সকালে বাঁস্জী অনায়াসে ও সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? অভিমানক্ষুদ্ধ বাঁস্জী কারও কথা শুনল না—সে জানতে চায়, কোথায় তার ক্রটি হল। কেন এভাবে আসর ত্যাগ করে গেলেন অমৃতনাথ।

মনোহরের বাসায় টাঙাটা যখন এসে পৌঁছালে তখন রাত একটা। অমৃতনাথ জেগে ছিলেন। আলো নিভিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ বসে ছিলেন। ফেরার পথে এতটা রাস্তা একটানা একা হেঁটে এসেছেন। এখন অপরাধবোধে ভুগছেন। ওরা কী ভাবল? কী কৈফিয়ত দেবেন বন্ধু মনোহরকে? ঠিক তখনই স্তব্ধ রাত্রির নীরবতা ছিন্ন করে গেটের ভিতর ঢুকল টাঙা। মনোহর ফিরে এসেছেন। কী বলবেন তাঁকে?

অমৃতনাথ উঠে এলেন বাইরের বারান্দায়। এসেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। তেওয়ারীজীর হাত ধরে টাঙা থেকে নেমে আসছে অন্ধ গায়িকা মীনাবাঈ। নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন অমৃতনাথ, কিন্তু যতই নিঃশব্দে অগ্রসর হন দৃষ্টিহীনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল অপরাধী নীরবে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সরাসরি প্রশ্নটায় নেমে এল বাঁস্জী। বললে, অব্ বাতাইয়ে—ক্যেও?

এতক্ষণ অনুশোচনায় ভুগছিলেন, কিন্তু এখন এভাবে মধ্যরাত্রিতে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে কৈফিয়ত চাওয়ায় অমৃতনাথ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। হিন্দীতে বললেন, বাঈজী, আমার অপরাধটা কি এতই গুরুতর যে, এত রাতে আমার কৈফিয়ত নিতে এসেছ?

—জী হাঁ! তবে আপনি আসর ছেড়ে উঠে আসার জন্য আমি কৈফিয়ত চাইতে আসিনি—আমি জানতে এসেছি—কেন আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজী হয়ে আমাকে ঝুটা আশীর্বাদ করলেন!

—ঝুটা আশীর্বাদ! তার মানে?

—যার গান শুনে শ্রোতা পালিয়ে বাঁচে তার সঙ্গীত-সাধনা কোনোদিন কি সিদ্ধিলাভ করে?

অমৃতনাথ ন্তান হয়ে গেলেন! এ অভিযোগের কী উত্তর দেবেন?

শেষে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাস কর মীনাবাঈ, তোমার গানের কোনো ত্রুটির জন্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমি উঠে আসতে বাধ্য হয়েছি। ত্রুটি তোমার নয়, আমারও নয়.....কীভাবে তোমাকে বোঝাব?

মীনাবাঈজী তার দুটি অঙ্গ চোখ মেলে বীভৎস মুখটা বাড়িয়ে ধরে বললে, পণ্ডিতজী, আপনি কি বুঝতে পারেন না—না বুঝে গেলে যে আমারও চলবে না। আজকের এই ঘটনাটা, আজকের এই অসাফল্য জিন্দেগীভর আমার মনে কাঁটা হয়ে বিধে থাকবে?

অমৃতনাথ অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। তারপর মনস্থির করে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ মীনাবহিনী! সব কথা আমাকে অকপটে স্বীকার করে যেতে হবে। না হলে জিন্দেগীভর এ-কথাটা আমারও মনে কাঁটা হয়ে বিধে থাকবে। শোন! তোমার গান শুনে প্রথম থেকেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন ‘দরদভরি গানা’ আমি বহু-বহুদিন শুনিনি। আমার মনে হচ্ছিল—এটা বেতিয়া নয়, বৃন্দাবন! আমি অমৃতনাথ নই, আমি সেই বংশীওয়ালা! আর তুমিও আগুনে পুড়ে আজ খাঁটি সোনা হয়েছ—তুমি সেই বিরহ-কাতরা গোরোচনা গোরি! আমি.....আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না!.....তারপর যখন তুমি খাম্বাজ-পিলুতে ঠুংরি ধরলে :

বোলো মোরে রাজা

কাঁহা গোঁয়ারি সারা রাতিয়া।

সোতনকে সঙ্গ হাসত খেলত তু

হাম সঙ্গ করত রুঠি রুঠি বাতিয়া।।

—তখন আমার মনে হল—তাই তো! আমার এমন শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করে আমি কেন ঝুটো মুক্তো নিয়ে পড়ে আছি। সম্মোহিতের মতো আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম—আসরে কেউ খেয়াল করেনি। সেই খণ্ডমুহূর্তেই যদি আমার চেতনা ফিরে না আসত তাহলে হয়তো পরমুহূর্তেই আমি ছুটে গিয়ে তোমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতাম! হয়তো চুষন করে বসতাম তোমাকে! বিশ্বাস কর বহিনজী—আমি ভয় পেয়ে গেলাম! কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না দেখতে পেয়ে—অশালীন কিছু করে বসার আগেই—পালিয়ে এসেছি।

দন্ধাননী মীনাবাঈয়ের দুটি অঙ্গ নয়নে তখন নেমেছে দুটি জলের ধারা। মুহূর্তে সে লুটিয়ে পড়ে ব্রাহ্মণের চরণতলে। ওঁর পায়ে অশ্রু-আর্দ্র মুখটা নামিয়ে দিয়ে বললে, পণ্ডিতজী! তুমি আজ আমাকে যা দিলে—কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে তার চেয়ে বড় পুরস্কার দিতে পারেনি!

পাঁচ

গুরুজীর দেহান্তে তাঁরই অনুকরণে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাসায় দুর্লভচন্দ্র মার্গ-সঙ্গীতের অনিবার্ণ প্রদীপখানি জেলে রাখলেন। দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি শিক্ষানবীশদের বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আত্মসচেতন ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গে বলতেন—বিদ্যাকে দান করা যায়, গ্রহণ করা যায়, ক্রয়-বিক্রয় চলে না। বিলানোই চলে, বেসাতি চলে না।

ভট্টাচার্য মশায়ের গৃহসংলগ্ন কোনো তিস্তিড়ি-বৃক্ষের সন্ধান আমি পাইনি। তাই জানি না সঙ্গীতপাগল বুনো-রামনাথটিকে ব্রাহ্মণী কী রেষে খেতে দিতেন। যজন-যাজন অবশ্য করতেন—তার

উপার্জন সামান্যই। তবু ঐ একটি বিষয়ে তিনি আপসহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বহুবার বহু বড় জমিদারবাড়ি থেকে মোটা মুজ্জরো নেবার অনুরোধ এসেছে—সরাসরি প্রত্যাখান করেছেন। বলেছেন, যাই যদি এমনিতেই যাব, এমনিতে বাজাব। আমাকে বায়না করা যায় না! শুধু নগদ অর্থ নয়, প্রকারান্তরেও অন্য কোন সাহায্য কিংবা পুরস্কার তিনি গ্রহণ করতেন না, বলতেন রাজার-রাজার কাছে হাত তো পেতেই আছি, প্রসাদ নিলে তাঁর কাছ থেকেই নেব—এঁদের কাছ থেকে উচ্ছিস্ট নেব কেন?

একবার উত্তর কলকাতার একজন সুপরিচিত সঙ্গীতপ্রেমী ধনীরা বাড়িতে দুর্লভচন্দ্র সঙ্গত করতে যান। গৃহকর্তা জানতেন যে, দুর্লভ বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় বাজাতে এসেছেন। সঙ্গত শেষ হলে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভট্টাচার্যমশাইকে একখানি বহুমূল্য শাল উপহার দেন। সর্বসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করলে গৃহকর্তার অসম্মান হয়, তাই দুর্লভ বিনাবাক্যব্যয়ে শালটি গ্রহণ করেন। আসর ভাঙলে দুর্লভচন্দ্রকে গৃহদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন গৃহস্বামী। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল গৃহকর্তার কিশোর পুত্রটি। দুর্লভ চট করে শালটি সেই কিশোরের গলায় জড়িয়ে দিলেন।

গৃহকর্তা ক্ষুব্ধ না হলেও মর্মাহত হয়েছিলেন। বললেন, এটা কেমনতর হল ভট্টাচার্যমশাই?

দুর্লভচন্দ্র ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, রাজঘোটক হল এতক্ষণে। ছেঁড়া ধূতি চলবে টিলে লয়ে আর শাল চলবে টো-দুনে—তা কি বরদাস্ত করি আমি? ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখুন—কী সুন্দর মানিয়েছে!

*

*

*

একই কারণে রেডিওতে তিনি বাজাতে চাইতেন না। সঙ্গীত সম্মেলন সম্বন্ধেও তাই। অনেক পীড়াপীড়িতে একবার মাত্র কাশীতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে বাজিয়েছিলেন। এ ছাড়া একবার কলকাতার নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনেও সঙ্গত করেছিলেন। অথচ ঘরোয়া বৈঠকে বহু আসরে বহুবার ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে বসেছেন মৃদঙ্গ নিয়ে। দুর্লভচন্দ্রের সমসাময়িক এমন কোনো ধ্রুপদীয়া নেই যাঁর সঙ্গে তিনি সঙ্গত না করেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজা চক্রবর্তী অথবা মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রাও, লছমীনারায়ণ মিশ্র, অমর ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অযোধ্যারাম পাঠকের সঙ্গে প্রহরের পর প্রহর মৃদঙ্গ সঙ্গত করে গিয়েছেন দুর্লভচন্দ্র। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ও তিনি বহু আসরে বহুবার সঙ্গত করেছেন। দুর্লভচন্দ্রের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বশ্রী প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ সান্যাল, নরেন্দ্র বাগচি, সুবোধচন্দ্র দে, জিতেন সাঁতরা প্রভৃতি পাখোয়াজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুত্র হরেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ভ্রাতৃপুত্র ঘনশ্যামের উপরেও তাঁর আশীর্বাদ আছে।

নিজের গুরু শ্রুতিরক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ধরে প্রতি বছর তিনি ‘মুরারী সম্মেলন’ করতেন। শুধু কলকাতা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ নয়, অনেকবার সর্বভারতীয় সঙ্গীতাসচর্যরাও সে আসরে এসে গিয়েছেন, বাজিয়েছেন। শুধু বিভিন্ন আসরে গিয়ে মৃদঙ্গ-সঙ্গত করাই নয়, বিভিন্ন আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে মার্গ-সঙ্গীতের স্বরূপটা বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন, তার বিবর্তন ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং কড়ি-মধ্যমের সামান্য ইতরবিশেষ নিয়ে প্রহরের পর প্রহর সহযোগী ও শিষ্যদের নিয়ে মেতে থাকতেন।

ওঁর সময়কালেই ধীরে ধীরে ধ্রুপদ-ধামারের ক্রমাবলুপ্তি ঘটতে থাকে; খেয়াল-ঠুংরি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে লোকরঞ্জন সঙ্গীতের পরিচয় বহন করে। পেট্রোল-চালিত মোটর গাড়ির আবির্ভাবে যেভাবে চারঘোড়ার জুড়িগাড়িকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, প্রায় তেমনভাবেই ডুগি-তবলার আগমনে শুরু হয়ে গেল মৃদঙ্গ। শেষ জীবনে এ-জন্য দুর্লভচন্দ্র মনে হয় কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

তাঁর ক্ষোভের আর একটি কারণ ছিল এই যে, মার্গ-সঙ্গীতের কট্টর পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারতেন না। সংস্কারবিরোধী কট্টর পণ্ডিতদের মতে ধ্রুপদীয়া-সঙ্গীতের পথ পাথর দিয়ে বাঁধানো—একচুল বিচ্যুতি সে মানবে না; ক্ষমতা থাকে তবে সেই বাঁধা-সড়কের মধ্যেই তোমাকে রাগরূপ সৃজন করতে হবে। দুর্লভচন্দ্র তাঁর যৌবনে শোনা গুরুর উপদেশটি ভুলতে পারেননি—সেই আশ্চর্য শেষরাত্রের অভিজ্ঞতা। শিষ্যদের বলতেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাঠামোটি রেখে তার বাহুল্যকে

বর্জন করে মার্গ-সঙ্গীতকে যুগোপযোগী করতে হবে। শুধুমাত্র শাসনে কখনও সবুজকে জিইয়ে রাখা যায় না। শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠান-শৃঙ্খলে সুরলক্ষ্মীকে এভাবে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে প্রতিমার কাঠামোটাই থাকবে, তাতে প্রাণ থাকবে না।

শিষ্যদের তাই প্রায়ই বলতেন, মূল হিন্দুস্থানী গানের পরিবর্তে রবীবাবুকৃত তার বাঙলা রূপান্তরই তাঁর বেশি ভাল লাগে। ‘বহুর বজাও বংশী’র (পূর্ববী/তেওরা) বদলে ‘আজি এ আনন্দসন্ধ্যা’ কিংবা ‘বুঁদ পবন পুররবাঈ’ (হাশীর/চোতাল)-এর পরিবর্তে ‘এসেছে সকলে কত আশে’। শুধু সুরানুবাদিত গানই নয়, রবীন্দ্রনাথের যেসব নিজস্ব ধ্রুপদাঙ্গ রচনা সংগ্রহ করতে পারতেন তা শিষ্যদের গেয়ে শোনাতে বলতেন এবং মৃদঙ্গ তুলে নিয়ে তার সাথে সঙ্গত করতেন। ‘নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে’ (বাগেশী/তেওরা), ‘দাঁড়াও আমার আঁখির আগে’ (বেহাগ/তেওরা), কিংবা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধামার ‘হৃদিমন্দির-দ্বারে বাজে’ (কেদারা)।

গুরু মুরারীমোহনের দেহান্ত হয়েছিল ১৯০৪-এ। তার পরের বছর থেকেই দুর্লভচন্দ্র গুরুর স্মৃতিতে মুরারী-সম্মেলনের আয়োজন করেন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই বার্ষিক অনুষ্ঠান চলেছিল—ছেদ পড়ল দুর্লভচন্দ্রের দেহাবসানে। মুরারী-সম্মেলন শুরু হবার ক-বছর পরে শুরু হয়েছিল বার্ষিক ‘শঙ্কর উৎসব’; তার অনুষ্ঠান হত রাধানাথ মল্লিক লেনে শিবচতুর্দশীর সারারাত্রি-ব্যাপী। তারও পরে, বস্তুত ১৯২৮ থেকে, শুরু হয় লালচাঁদ উৎসব। এই তিনটি বার্ষিক সম্মেলনই ছিল সঙ্গীতপ্রিয়ের কাছে অব্যবহৃত—টিকিট কাটতে হত না। এর ভেতর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল দুর্লভচন্দ্রের ‘মুরারী-সম্মেলন’। বহু সঙ্গীতাচার্য এসে এখানে মুরারীমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন। এসেছেন ভারতবিখ্যাত তবলিয়া কেরামতউল্লা খাঁ, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও, আমীর খাঁ, সেতারা এনায়েৎ খাঁ-সাবেব, সারেসঙ্গী ছোট্ট খাঁ। গায়কও এসেছেন অনেক, ধ্রুপদীয়ারাই বেশী—মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়; পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ বা দুর্লভচন্দ্ররা তো ছিলেনই। এই বার্ষিক সম্মেলন থেকেই আবার বিকশিত হয়েছেন কোনো কোনো শিল্পী—প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সঙ্গীত-সমাজে। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মোহিনীমোহন মিশ্র। ১৯২৮-এর মুরারী-সম্মেলনে আসর মাৎ করে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তিনি।

আসর বসেছে সন্ধ্যার কাছাকাছি। প্রবীণ ও নবীন শিল্পীতে আসর ভর্তি। সন্ধ্যা থেকেই আসর জমেছে। পরিণত বয়সী ধ্রুপদীয়া গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তরুণ শিল্পী মধুকণ্ঠী ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান শেষ হয়েছে। তারপর গাইলেন যোগীনবাবু—ধ্রুপদীয়া যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গান শেষ করে তাঁরা সবাই আসরেই রয়েছেন। এর পরেই ঘোষক শ্রোতৃবৃন্দকে জানানলেন অতঃপর সঙ্গীত পরিবেশন করছেন মোহিনীমোহন মিশ্র। রাত্রি তখন মধ্যযাম অতিক্রম করেছে, প্রায় একটা। ইতিপূর্বে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত গুণীরা আসরের মর্যাদা রেখে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মধ্যরাত্রে উনি কী দিয়ে শুরু করেন? রাগ নির্বাচনে ভুল হল না মোহিনীমোহনের—ধরলেন তান মেজাজী রাগ, দরবারী কানাড়া। আসরে এক্ষুটি সাড়া পড়ে গেল আলাপ শেষ হবার আগেই।

গান শেষ হল রাত আড়াইটায়।

সমস্ত আসর মোহিনীমোহনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রবীণ ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র সকলের হয়ে অনুরোধ করলেন মোহিনীমোহন যেন আর একখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গায়ক তখন বললেন, মৃদঙ্গের বদলে ডুগি-তবলা হলে ভাল হয়।

পাখোয়াজ যিনি বাজাচ্ছিলেন তিনি দুর্লভচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য। সরে এলেন তিনি। মোহিনীমোহন দেখলেন সম্মেলনের আহ্বায়ক নিজেই মৃদঙ্গটা সরিয়ে নিচ্ছেন।

মোহিনীমোহন তাঁকে বললেন, মৃদঙ্গের অপসারণে ভট্টাচার্যদা রাগ করলেন না তো?

মৃদঙ্গ-ক্রোড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন নামাবলী গায়ে পণ্ডিতমশাই। বললেন, করেছিই তো! তবে আমি টুলো-পণ্ডিত। বাঙালয় ‘রাগ’ জানি না, সংস্কৃতে ‘রাগ’ করেছি!

যারা সামনের দিকে ছিল এবং শুনতে পেয়েছিল তারা বুঝতে পারে স্বল্পভাষী দুর্লভচন্দ্র এভাবেই জানানলেন গায়কের দরবারী-কানাড়াটা তাঁর কত ভালো লেগেছে।

মোহিনীমোহন ধরলেন—খেয়াল। মালকোষে। আলাপ করলেন না, একেবারেই গান ধরলেন ত্রিতালের মধ্যলয়ে। কিন্তু তান কর্তবে মালকোষের বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তার করে আসরকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর খেয়াল যখন শেষ হল তখন রাত চারটে—ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিন্তু আসর যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে! কেউ ওঠেনি—কেউ বাড়ি যাবার কথা ভাবেনি। একই গায়কের কণ্ঠে ধ্রুপদ এবং খেয়ালের এমন যুগ্ম-বিকাশে সবাই মুগ্ধ। তাই খেয়াল শেষ হতেই সকলে সম্বরে বলে ওঠে, আর একখানি হোক মোহিনীবাবু।

মোহিনীমোহন যুক্ত করে বললেন আরও অনেক শিল্পীরা রয়েছেন।

যাঁরা এখনও আসরে গান করেননি তাঁরা বসেছিলেন এককোনায়ে। তাঁরা তিন-চারজনে একসঙ্গে বলে ওঠেন, সেই শিল্পীরাই দাবী করছেন—আর একখানা হোক!

এবার টপ্পা ধরলেন মোহিনীমোহন। স্বাস্থ্যজে। জমজমাট গিটকিরির কাজ শোনালেন এবার। গান শেষ হল যখন তখন ভোরের আকাশে আলো ফুটেছে। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যেও একটা অদ্ভুত সাড়া জেগেছে। এ কী আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! তাঁরা মোহিনীমোহনকে ছাড়লেন না—হোক, আরও হোক!

মিশ্রমশায়ের বয়স তখন চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ—যুবক নন। রাত একটা থেকে গাইছেন! কিন্তু সমস্ত আসরের সমবেত অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা শুনিয়েছেন; এবার ধরলেন ঠুংরি: কাফি!

সেখানেই শেষ নয়! আসরের সমাপ্তিসূচক গানখানি যখন গাইলেন তখন বেলা সাতটা। এবার ভজন। এমন বহুমুখী প্রতিভায় সারা আসর সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। গোপালচন্দ্র প্রমুখ সমবেত সঙ্গীতাচার্যরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন গায়কের। সেবার সম্মেলনে তিনিই হলেন যাকে বলে ‘হিরো!’ স্বল্পভাষী দুর্লভচন্দ্র কিন্তু কোনো প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেননি। সেই যে মধ্যরাত্রিতে ধ্রুপদ গানের পর মৃদঙ্গটি নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলেন তারপর আর মঞ্চে ওঠেননি—শ্রোতৃবৃন্দের সামনের সারিতে ঠায় বসেছিলেন—যেন ধ্যানে বসেছেন, সমংকায়শিরোগ্রীব! মোহিনীমোহন সমাপ্তি ভজন শেষ করে যখন শ্রোতৃবৃন্দের দিকে ফিরে নমস্কার করছেন তখন আবার মঞ্চে ফিরে এলেন উনি! মঞ্চের পিছনে টাঙানো ছিল ওঁর গুরু ‘মুরারীমোহন গুপ্তের একটি আলোখ্য। গতকাল সন্ধ্যারাত্রি সেই আলোখ্যে মাল্যদান করে সম্মেলন শুরু হয়েছিল। নামাবলী-গায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমশাই বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলেন সেই ছবিখানির দিকে। দু-হাতে খুলে নিলেন সেই গোড়ের-মালাটি এবং মোহিনীমোহনের নমস্কারের ভঙ্গিতে আনত মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিলেন সেই বাসিফুলের মালাখানি মিশ্র-মশায়ের কণ্ঠে!

এর চেয়ে বড় ‘পুরস্কার’ আর কী হতে পারত?

জানি না, মিশ্রমশাই বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বলেছিলেন কি না:

“নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।।”

ছয়

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

মুরারীমোহন গুপ্তের ভদ্রাসনে এসেছেন কয়েকজন জ্ঞানীগুণী; তার মধ্যে আছেন লালচাঁদ বড়াল। বিশেষ প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসম্মেলনে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসছেন। কলকাতায় তাঁর বিরাট সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হচ্ছে! এই সভায় কী গান গাওয়া হবে, কে গাইবেন তাই হচ্ছে আলোচ্য বিষয়। লালচাঁদ দুর্লভচন্দ্রের চেয়ে বছর-দুয়েকের বড় ছিলেন—দুজনেই তখন তরুণ—তেইশ-পঁচিশ। দুজনের আলাপ পরিচয় ছিল, সৌহার্দ্যও ছিল—যদিও দুজনের জগতে আপাতদৃষ্টিতে ব্যবধান আশ্মান-জমীন। লালচাঁদ সুবর্ণবর্ণিক, লক্ষপতির

সন্তান, সাহেব-সুৰো মহলে ঘোরেন, পিয়ানো বাজান—আর দুর্লভের পরিচয় তো আমরা আগেই জেনেছি। তবু এই দুই মহাদেশ—দুর্লভ এশিয়া ও লাল আমেরিকা, যাঁদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান—তাঁরাই রাগ-সঙ্গীতের বেরিংপ্রণালীতে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন।

মুরারীমোহন প্রশ্ন করলেন, সভাটা কোথায় হবে?

লালচাঁদ বললেন, শোভাবাজারে। স্যার রাধাকান্ত দেব মশায়ের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ স্বামীজীর ভাষণ। তার পূর্বে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর একটি অভিনন্দন পাঠ করবেন। কিন্তু তারও পূর্বে একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত চাই। আমাদের ইচ্ছা সেটা ধ্রুপদাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হবে। আপনি কী বলেন?

মুরারীমোহন বললেন, ভজনও হতে পারত। তবে যদি ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতই হয় তাহলে আমার পরামর্শ—গানটি হবে বাঙলায়, হিন্দীতে নয়।

লালচাঁদ একটু বিম্মিত হয়ে বলেন, বাঙলায় ধ্রুপদাঙ্গ মার্গ-সঙ্গীত? আছে?

—আছে। সম্বর্ধনা যখন বাঙলাদেশে হচ্ছে, কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে হচ্ছে, তখন আমরা গানটি মাতৃভাষায় গাই—এটাই আমার ইচ্ছা।

লালচাঁদ বললেন, ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত বাঙলাভাষায় গেয়ে শোনাতে পারেন?

—পারি। ধর তো দুলি!

মুরারীমোহন মাদঙ্গিক। গান করেন না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁকেই গেয়ে শোনাতে হবে। গাইবেন সেই গানখানি “আজি বহিছে বসন্ত পবন (বাহার/তেওরা)” যে গানখানি বছরকয়েক আগে শুনেছেন জোড়াসাঁকোয়—প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতির কণ্ঠে। গুরুর নির্দেশে দুর্লভচন্দ্র মৃদঙ্গটি কোলে তুলে নেন। বাধা দিলেন লালচাঁদ। বললেন, না! ওটা আমাকে দিন। আমি বাজাব।

দুর্লভ আকাশ থেকে পড়েন: আপনি! আপনি মৃদঙ্গ বাজাবেন!

হাসলেন লালচাঁদ। বললেন, আজ তো সবই উন্টোরকম হচ্ছে ভট্টাচার্যমশাই। ধ্রুপদ গান হচ্ছে বাঙলায়, হিন্দীতে নয়; গাইছেন মুরারীদা—যিনি, মাদঙ্গিক, গান করেন না! এ ক্ষেত্রে মৃদঙ্গ-সঙ্গত করা উচিত দুর্লভচন্দ্রের নয়, লালচাঁদের, যিনি পিয়ানো বাজান!

মুরারী তখন মিটিমিটি হাসছেন। কিন্তু দুর্লভচন্দ্র বললেন, বেশ, বাজান, কিন্তু ‘ধা’-টা ঠিক ধরতে পারবেন তো?

লালচাঁদ আবার হেসে বলেন, ‘পা’ ধরেছি যে গুরুর, ‘ধা’ ধরতে তিনিই শিখিয়েছেন দুলিবাবু! আমার গুরুকে আপনি চেনেন না, তাই অববড় কথাটা বললেন।

দুর্লভচন্দ্র কথার পিঠে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন মুরারীমোহন। বললেন, তুমি জান না দুলি, তুমি আমার কাছে আসার আগেই লালচাঁদ আমার কাছে মৃদঙ্গ শিখতে আসত। মৃদঙ্গ দিয়েই লালচাঁদের সঙ্গীত-জীবনের হাতেখড়ি, কিন্তু অভিমাত্রী লালচাঁদের হাতে মৃদঙ্গটা সইল না—তাই আজ ও পিয়ানো বাজায়!—কী লালচাঁদ, ঠিক বলিনি?

লালচাঁদ জবাব দিলেন না। মৃদু হাসলেন।

গান শুরু করলেন মুরারীমোহন—বিখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীতকার ও পিয়ানোবাদক লালচাঁদ ‘ধা’ ধরলেন নির্ভুল; তেওড়া-তালে বাজিয়ে গেলেন অনায়াস ভঙ্গীতে, যেন মাদলই তাঁর যন্ত্র, তন্তুবায়ের হাতে তাঁতের মাকু, কুস্তকারের হাতে চাক!

গান শেষ হলে দুর্লভচন্দ্র বললেন, মৃদঙ্গ বাজনা ছেড়ে দিলেন কেন তাহলে?

লালচাঁদ এবারও হেসে বললেন, সে-কথা তো গুরুই শোনালেন, গুরুভাই! অভিমানে!

—কী রকম?—কৌতুহলী দুর্লভচন্দ্র জানতে চান।

লালচাঁদ বলেন, সে গল্প আর একদিন শোনাব। এখন আসুন, আমরা কাজের কথায় ফিরে আসি। কাজের কথায় ওঁরা ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু দুর্লভচন্দ্র আর সেই করুণ কাহিনীটি শুনে যেতে পারেননি। সে গল্প আর করেননি লালচাঁদ, সে প্রসঙ্গ আর ওঠেনি ওঁদের আসরে।

লালচাঁদের সেই অকথিত কাহিনীটি আমি কিন্তু শুনেছিলাম আর এক পরিবেশে, আর একজনের কাছে—এ ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর পরে। হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তা হোক—আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ করে যাই:

আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগেকার কথা। এই শতাব্দীর বয়সও তখন ঐ—আটত্রিশ!

আমি তখন হিন্দু স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ি, আজ যাকে আপনারা বলেন ক্লাস এইট। থাকি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে। সেখানেই আমার বাবার একখানা বাড়ি ছিল। ১/২ সি-তে। লালচাঁদও ছিলেন ঐ একই গলির বাসিন্দা—গলিটার নাম লালচাঁদের পিতামহের নামে। আর লালচাঁদের দুই পৌত্র দুনিচাঁদ ও সখীচাঁদ ছিল আমার সহপাঠী। দুনি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারত। পরে অনেক ছায়াছবিতে সে পিয়ানো বাজিয়েছে, সুরারোপ করেছে, সঙ্গীত পরিচালনা করেছে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি তখন দুনির বয়স তেরো-চোদ্দো। তবু ঐ বয়সেই সে পিয়ানোবাদনে দক্ষতা অর্জন করেছিল।

ছুটির দিন। দুনির বাড়ি যেতে হল। কেজো ভূমিকায়। কয়েকদিন অসুস্থ থাকায় স্কুল কামাই করেছে, পড়া জেনে নিতে। গেটে থাকে দারোয়ান—বিরট চকমেলানো বাড়ি। দুনির কথা বলতেই দারোয়ান বললে, দুনিবাবু পিয়ানো কামরামে হাঁয়, যাইয়ে না উপর!

পিয়ানো-কামরা? ওদের বাড়িতে আবার পিয়ানো-কামরা আছে নাকি? দুনিদের বাড়িতে যখনই গিয়েছি বসেছি নীচের একখানি ঘরে। সে-ঘরে ছিল একটি টেবিল-টেনিস (তখন আমরা বলতাম 'পিং-পং') বোর্ড। খেলাটা কলকাতায় নতুন চালু হয়েছে। সেই খেলা খেলতেই যেতাম। এখন দারোয়ানের নির্দেশে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে যেতে হল। সিঁড়ির মুখে একটি সাদা মার্বেলের নারীমূর্তি। মনে আছে কিশোর বয়সের সঙ্কোচে আমি মূর্তিটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি।

দুনি বসেছিল পিয়ানো ঘরে। প্রকাণ্ড একটা পিয়ানোর সামনে টুলে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল সে। এদেশী গৎ নয়—মোজার্ট, বিতোফেন কী অভ্যাস করছিল সে তা সেই জানে! আমার মনে হচ্ছিল একটা বড় বইছে সেই ঘরের ভেতর। সার্শি-পাল্লাগুলো যেন থরথর করে কাঁপছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে বাজনা থামিয়ে ঘুরে বসে: কী রে! তুই কখন এলি?

পড়া জিজ্ঞাসার কথা তখন আমি ভুলে গেছি। সবিষ্ময়ে দেখছি সেই প্রকাণ্ড পিয়ানো যন্ত্রটা। এত বড় এবং এমন শৌখিন পিয়ানো যন্ত্র আমি আগে কখনও দেখিনি। প্রশ্ন করি, হাঁরে দুনি, এটার দাম কত রে?

—দাম? দাম তো জানি না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—'সাত পয়জার।' তার মানে কী, তা আমি আজও জানি না।

আমিও জানি না। হাজার টাকার নোট হয় শুনেছি। 'পয়জার' কি তেমন দশ-বিশ হাজার টাকার নোট? দুনি বললে, এটা আমাদের কেনা হয়নি। ঠাকুর্দা উপহার পেয়েছিলেন।

উপহার! এত প্রকাণ্ড উপহার—যার দাম নাকি 'সাত পয়জার'; তা কেউ কাউকে উপহার দেয়? প্রশ্ন করলাম, এত দামী উপহার তাঁকে কে দিয়েছিলেন?

—গভর্নর বাহাদুর!

আমি ভয়ে ভয়ে আবলুশ কাঠের মতো কালো মসৃণ পিয়ানোটার গায়ে একবার হাত ছোঁয়ালুম। দুনি বললে, আমার ঠাকুর্দার গল্প শুনবি? লালচাঁদ বড়ালের কথা?

আমি বললুম, শুনব। বল!

দুনি আমাকে শুনিয়েছিল তার পিতামহের কাহিনী। পরে লালচাঁদের জীবনীও পড়েছি। তারই চূষকসার এখানে লিপিবদ্ধ করি :

লালচাঁদ হচ্ছেন বিখ্যাত সুবর্ণবণিক প্রেমচাঁদ বড়ালের পৌত্র, সেকালের প্রসিদ্ধ এ্যাটর্নি নবীনচাঁদ বড়ালের একমাত্র পুত্র। প্রেমচাঁদ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন অনুরাগী ভক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশন হত প্রেমচাঁদের বাড়িতে, সেই সাপ্তাহিক ধর্মসভায় বালক লালচাঁদ মাঝে মাঝে ধর্মসঙ্গীত গেয়ে শোনাতে। যতদূর জানা যায় বালক লালচাঁদ জোড়াসাঁকোর মূল সমাজ-

মন্দিরে শুনে শুনে সেই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি শিখেছিলেন। এছাড়া প্রেমচাঁদের বাড়িতে সঙ্গীতচর্চার আর কোন পরিবেশ ছিল না।

প্রেমচাঁদের পরবর্তী পুরুষে, নবীনচাঁদের আমলে, সেই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটিও আর খুব নিয়মিত হত না। ফলে বালক লালচাঁদের গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। নবীনচাঁদ ছিলেন সাহেবী-কেতার মানুষ, কলকাতা হাইকোর্টের একজন সুপরিচিত এ্যাটর্নি। ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে টেম্পল-চেম্বার্সে তাঁর এ্যাটর্নি-ফার্ম : এন. সি. বড়াল এ্যান্ড পাইন। নবীনচাঁদ ছিলেন কৃতি, ধনবান, অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, লালচাঁদের ছাত্রজীবনে সঙ্গীতচর্চাটা একেবারেই বরদাস্ত হয়নি নবীনচাঁদের! গান-বাজনা, ডুগি-তবলার ধারে-কাছে যেতে দিতেন না একমাত্র পুত্রকে। তাকে ভর্তি করিয়েছিলেন হিন্দু স্কুল, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে।

পুত্রের কিন্তু বিদ্যার চেয়ে সঙ্গীতের দিকেই অনুরাগ বেশি। সে আমলে মার্গ-সঙ্গীত বলতে সবাই বুঝত ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত—আমরা এখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে আছি। স্কুলে পড়বার সময়েই হিন্দু স্কুল থেকে পালিয়ে তিনি চলে যেতেন ঠনঠনিয়ায়—বসতেন গিয়ে মুরারীমোহনের সঙ্গীত শিক্ষার আসরে। মুরারীমোহন ঐ বালকের তীব্র আগ্রহ দেখে শেখাতে শুরু করেন। নবীনচাঁদ ব্যস্ত মানুষ, মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করতেন—লালু কোথায়? স্কুল থেকে এখনও ফেরেনি? কোথায় কোথায় ঘোরো?

নবীনচন্দ্রের স্ত্রী, লালচাঁদের জননী, বিখ্যাত ও বদান্য বিত্তশালী সাগরলাল দত্তের কন্যা। তিনি সমস্তই জানতেন—কিন্তু কর্তার কাছে ভাঙতেন না। জানতেন, কারণ লালচাঁদ অকপটে মায়ের কাছে সব কথা স্বীকার করেছিলেন। প্রাণের দায়ে! তাঁর তখন একটি নিজস্ব মৃদঙ্গের নিত্যন্ত প্রয়োজন—যা পকেটম্যানি থেকে কেনা যায় না। জননী কর্তাকে লুকিয়ে পুত্রকে অর্থসাহায্য করেছিলেন এবং ঐ সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—ও মাদল-টাদল যেন বাড়িতে নিয়ে আসিস না।

পুত্র জননীকে আশ্বস্ত করেছিল: পাগল!

সেদিক থেকে চাঁদ খালিফা। মৃদঙ্গটি বাড়িতেও আনেননি, কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতেও রাখেননি—পাছে জানাজানি হয়ে যায়। সেটি গচ্ছিত রাখা ছিল হিন্দু স্কুলের কাছাকাছি একটি মুন্দির দোকানে। স্কুল ছুটির পর এবং স্কুল ছুটির দিনে 'ইস্কুল যাচ্ছি' বলে তিনি হাজির হতেন সেই মুন্দির দোকানে। বাইরের দিকে তেল-নুন-চাল-ডাল বিকিকিনি হত আর মুন্দির গুদামে গুড়ের নাগরি আর কেরোসিন-টিনের খাঁজে ঠাঁই করে নিয়ে বালক লালচাঁদ আপন মনে বাজিয়ে চলতেন—ধা-ধা-ধিন্ ধা! দোকানীকে কিছু দিতে হত না, শুধু সে যখন দুপুর-নাগাদ একটু নিদ্রা দিত তখন লালচাঁদকে মাদলের বদলে দোকানে ঠেকা দিকে হত—খদ্দেরকে যাতে বিমুখ না হতে হয়।

*

*

*

ক্রমশ একলব্যের সাধনায় লালচাঁদ হয়ে উঠলেন দক্ষ মাদঙ্গিক। তাঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন এন্টালীর হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মধুকর্তী গায়ক, ধ্রুপদ গান শিখতেন বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে। সময়-সুযোগ মতো লালচাঁদ বসেন হরিনাথের সঙ্গে। দুজনই দুজনকে চান—গায়ক না হলে লালচাঁদের চলে না, বাদক না হলে যেমন চলে না হরিনাথের। শেষে একদিন হরিনাথ বললেন, লালু, আমি শনিবার একটা আসরে গাইতে যাব, তুই বাজাবি?

লালচাঁদের মনে পড়ল তাঁর পিতৃদেব শনিবারে একটা পার্টিতে যাবেন। ফলে রাত করে বাড়ি ফেরার অসুবিধা নেই। বলেন, যাব।

আসরে বালক লালচাঁদ মৃদঙ্গ বাজিয়ে সকলের প্রশংসা কুড়োলেন। সেদিনই তিনি বন্ধু হরিনাথকে বললেন, আমার খুব ইচ্ছে করে তোঁর গুরুদেবের সঙ্গে একবার সঙ্গত করি।

হরিনাথ বলেন, বাজাতে তুই ঠিকই পারবি, কিন্তু প্রস্তাবটা আমার করা ঠিক হবে না। তবে ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাধ্যমে কথাটা পাড়া হল অঘোরনাথের কাছে। অঘোরনাথ সম্মত হলেন এবং পরদিন বাদককে আসতে বললেন তাঁর বাড়িতে। অনেক আশা বুকে নিয়ে লালচাঁদ তাঁর নিজস্ব মাদলটি ঘাড়ে করে এসে উপস্থিত হলেন অঘোরনাথের ভদ্রাসনে। কারণটা জানি না, বোধকরি লালচাঁদের বয়সটা দেখেই অঘোরনাথ ঘোষণা করলেন, সেদিন

তঁার গান গাইবার মেজাজ নেই। লালচাঁদ মর্মাহত হলেন। যাই হোক, পরদিন পুনরায় পাখোয়াজ ঘাড়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন আসরে, কিন্তু সেদিনও চক্রবর্তীমশায়ের গান গাইবার মেজাজ হল না। তৃতীয় দিনে পুনরায় এলেন লালচাঁদ, কিন্তু আবার নিরাশ হতে হল তাঁকে—অঘোরনাথ সেদিনও গাইলেন না।

‘দুস্তোর!’ বলে বেরিয়ে এলেন লালচাঁদ! যে বিদ্যা এমনভাবে পরনির্ভর তা শিখবেনই না তিনি। উনি কি ভিখারী? কবে গায়কের মর্জি হবে তবে বাজাবার সুযোগ পাবেন! মুহূর্তে সিদ্ধান্তে এলেন—আর পাখোয়াজ নয়; এবার গান গাইবেন। কণ্ঠসঙ্গীত। ধরে পড়লেন বন্ধু হরিনাথকে, তুই আমাকে শেখা।

হরিনাথ হেসে বলে, দূর! হাত থাকলে পাখোয়াজ বাজানো যায়, কিন্তু গলা থাকলেই গান গাওয়া যায় না। বুঝলি? তোর যা হেঁড়ে গলা—

লালচাঁদ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, হাত থাকলেও পাখোয়াজ বাজানো যায় না হরি! তুই না শেখাস নাই শেখাবি! কিন্তু দেখে নিস গান আমি শিখবই।

এরপর কণ্ঠ-সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকলেন লালচাঁদ। পেশাদার ওস্তাদের কাছে শিখবেন। মনোবাসনার কথা জানালেন জননীর কাছে। তিনি বললেন, শেখ! টাকা দেব আমি, কিন্তু খবরদার! কর্তা না জানতে পারেন।

পুত্র পুনরুক্তি করেছিল: পাগল!

*

*

*

কিন্তু কর্তা জানতে পারলেন। অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে। কলকাতার সঙ্গীত ইতিহাসে সে একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল! যেন বাস্তব ঘটনা নয়, নাটকের একটি দৃশ্য।

কলকাতায় তখন ফ্রীমেসনদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল—লজ এ্যাস্কর। সরকারী মহলের তা-বড় তা-বড় হোমড়া-চোমড়া, কিছু ব্যবসায়ী ও ইংরাজ বণিক ছিলেন তার সভ্য। লজের বার্ষিক অধিবেশনটি হত রাজকীয় ব্যবস্থাপনায়। খানাপিনা এবং ঐ সঙ্গে যুরোপীয় সঙ্গীতের ব্যবস্থা। সে-বৎসর লজের ‘গ্র্যান্ডমাস্টার’ অর্থাৎ চেয়ারম্যান বা সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত এ্যাটর্নী নবীনচাঁদ বড়াল।

লালচাঁদ তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ. এ. পড়েন। পিতা সংবাদ রাখেন না, পুত্র কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্সের জনৈক যুরোপীয় ফাদারের কাছে নিয়মিত পিয়ানো শিখছেন। শিখছেন ইংরাজি গান। দুটি বিষয়েই তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। ফাদার বললেন, লালচাঁদ, তুমি এবার আমাদের ‘লজ’-এর পার্টিতে গাইবে এবং বাজাবে।

লালচাঁদ প্রথমটা জানতেন না সে সভায় পিতৃদেব উপস্থিত থাকবেন, বস্তুত নবীনচাঁদই গ্র্যান্ড-মাস্টার। এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। পরে যখন ছাপানো কাগজ দেখলেন তখন বুঝলেন কী সর্বনাশ হতে চলেছে! কিন্তু উপায় কী? এতদূর অগ্রসর হয়ে কোন লজ্জায় তিনি সব কথা স্বীকার করেন? ‘যা থাকে বরাতে’ বলে লালচাঁদ চেপে গেলেন।

যথাসময়ে লজ-এর বার্ষিক অধিবেশন বসল। সেবার সভাপতি হয়ে এসেছেন স্বয়ং গভর্নর বাহাদুর। নবীনচাঁদ গ্র্যান্ড-মাস্টার, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সব তদারক করছেন, আর লালচাঁদ এক অঙ্ককার কোনায় ঘাপটি মেয়ে লুকিয়ে বসে আছেন। সহসা ঘোষকের একটা ঘোষণা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন নবীনচাঁদ—এর মানে?

ঘোষক বললেন, এবার আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান : পিয়ানোবাদন। বাজাচ্ছেন মাস্টার লালচাঁদ বড়াল।

লালচাঁদ বড়াল! তার মানে? হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই। অপরিচিত কেউ নয়। সভাস্থলের একান্তে রাখা ছিল প্রকাশ একটি গ্র্যান্ড-পিয়ানো। লালচাঁদ টুলের ওপর বসে সুরের ঝঙ্কার তুললেন। কয়েক মিনিটের ভেতরেই তিনি শ্রোতৃদলের হৃদয় জয় করে ফেললেন অপূর্ব দক্ষতায়, সুনিপুণ আঙুলের কারুকার্যে। ব্যতিক্রম শুধু একজন। তিনি স্তম্ভিত!

বাজনা শেষ হতেই করতালি ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সভাগৃহ। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। গভর্নর-পত্নী নবীনচাঁদকে কাছে ডেকে বললেন, ইওর স্ন? হাউ স্প্লেন্ডিড। খুব যত্ন নিয়ে শিখিয়েছেন তো!

নবীনচাঁদের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল!

ঘোষক বললেন, এবার ইংরাজি সঙ্গীত—গাইছেন একই শিল্পী।

লালচাঁদ একটি ইংরাজি সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন। এবারও করতালিধ্বনিতে সভাকক্ষ ফেটে পড়ার উপক্রম করল। চাফ-জাস্টিস্ নবীনচাঁদকে বললেন, ‘এভরিওয়ান অব আস ইস এনভিয়াস্ অব্ ইউ, বড়াল!—[আজ সবাই তোমার সম্মানভাগ্যকে ঈর্ষা করছে বড়াল।]

এবারও জবাব দিতে পারেননি নবীনচাঁদ।

সভার শেষে আবার একটি দুর্ঘটনা। উদ্যোক্তারা কী যেন বলাবলি করে স্বয়ং গভর্নর বাহাদুরের কাছে এসে একটা দরবার করলেন। শিরঃসঞ্চালনে গভর্নর সম্মতি জানালেন। ঘোষক এগিয়ে এসে বললেন,—তরুণ ভারতীয় বাদক ও গায়ক লালচাঁদ বড়ালের অসাধারণ সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে ‘লজ’ তাঁকে ঐ পিয়ানোট উপহার দিতে ইচ্ছুক। লজের তরফে স্বয়ং সম্মানিত প্রধান-অতিথি গভর্নর বাহাদুর এবার সেটি উপহার দিচ্ছেন।

করতালি! করতালি! আর করতালি। লালচাঁদ বারে বারে ‘বাও’ করছেন। অনুষ্ঠান শেষে পিতাপুত্র বাড়ি ফিরলেন একই গাড়িতে।

সমস্ত পথ নবীনচাঁদ বিস্ফোরণ-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো বসে আছেন। মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধ কলকাতাকে সচকিত করে ওয়েলার ঘোড়া ছুটেছে চৌরঙ্গী থেকে বউবাজারে। পিতাপুত্র মুখোমুখি। কেউ কথা বলছেন না। লালচাঁদ চোরাদৃষ্টিতে এক-একবার চেয়ে দেখছেন বাপের দিকে। বাড়ির কাছাকাছি এসে নবীনচাঁদ প্রথম কথা বললেন, কোথায় শিখেছিস এসব? ঐ বাজনা আর গান?

আয়ত দুটি চোখ পিতার দিকে মেলে লালচাঁদ অকপট সত্যভাষণ করেন : কলেজে! সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে! একজন ফাদারের কাছে!

দারুণ অবাক হয়ে গেলেন নবীনচাঁদ: কলেজে! সেন্ট জেভিয়ার্সে আজকাল গান-বাজনা শেখানো হয়! আচ্ছা, আমি কালই দেখা করব রেকটারের সঙ্গে!

বাড়ি ফিরেই তলব করলেন পরের ঘরের মেয়েটিকে, ওগো শুনছ! তোমার ছেলে পিয়ানো বাজিয়ে গভর্নর বাহাদুরের কাছ থেকে পিয়ানো পুরস্কার পেয়েছে।

জননী উচ্ছসিত হয়ে ওঠেন, তাই নাকি? কই, লালু কই?

লালু তখন মুখখানা কোথায় লুকাবে ভেবে পাচ্ছে না।

নবীনচাঁদ বলেন, তুমিই ওর মাথাটি খাচ্ছ! শোন। কাল থেকে ও হতভাগাকে আর কলেজে যেতে হবে না। আমার সঙ্গে দপ্তরে যাবে।

লালচাঁদের জননী বুদ্ধিমতী—বোঝেন, এটা রাগের কথা। পুত্রের শিক্ষাদান বিষয়ে নবীনচাঁদ অত্যন্ত সচেতন।

*

*

*

বাংলাদেশের সঙ্গীত ইতিহাসে লালচাঁদ বড়াল একটি ধুমকেতু। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম রেকর্ড করেন, মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয় (১৯০৭)। এই ছয় বছরের ভেতর তিনি আঠাশখানি গানের রেকর্ড করিয়েছিলেন। প্রায় সবই খেয়াল, টপ্পা-খেয়াল-অঙ্গের, বাঙলা ভাষায়। মাত্র দুটি ছিল কীর্তন, যা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত : ‘মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব’ এবং ‘যমুনে! তুমি এই কি সেই যমুনে প্রবাহিণী’। দুখানি হিন্দী গান, বাকি চব্বিশখানি—সিন্ধু, বেহাগ, আলাইয়া, কাফি, রামকেলী, বাগেত্রী, শঙ্করা, ভূপালী, খায়াজ ইত্যাদি।

লালচাঁদ ঐ পাঁচ-সাত বছরের জন্য ছিলেন বাংলাদেশে অবিসংবাদিত গানের রাজা! রেকর্ড কোম্পানির ব্যবসায় ব্যালেন্স-শীটকে তিনি পালটে দিয়েছিলেন—কিন্তু নিজে এক কপর্দক দক্ষিণা নেননি। লালচাঁদ যে আসরে উপস্থিত থাকেন সেখানে সবাই তাঁর গান শুনতে চায়। একবার একটি আসরে তিনি আবির্ভূত হতেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অমনি হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। সে আসরে অঘোরনাথ চক্রবর্তীও উপস্থিত। লালচাঁদের গান শেষ হলে সঙ্গীতাচার্য অঘোরনাথ তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আশীর্বাদ করলেন। লালচাঁদ সহাস্যে প্রললেন, আপনি জানেন না, কিন্তু আপনার জন্যই আমি গায়ক হয়েছি, না হলে মাদঙ্গিক হবার কথা আমার।

আঘোরনাথ বলেন, কী রকম?

লালচাঁদ অকপটে সব কথা বলে গেলেন।

লালচাঁদ পিতার সঙ্গে টেম্পল চেম্বার্সেও যেতেন; কিন্তু পাঁচটা বাজলেই উঠে পড়তেন। নানান আসরে তাঁর আমন্ত্রণ থাকত। নবীনচাঁদ একাই অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করতেন।

লালচাঁদের অকালমৃত্যুতে, বলাবাহুল্য, প্রচণ্ড শোক পেয়েছিলেন নবীনচাঁদ।

নানান ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন খবর এল, আফগানিস্থানের আমীর লালচাঁদের একটি রেকর্ড শুনে এত অভিভূত হয়েছেন যে, তিনি স্বকর্ণে তাঁর গান শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমীরের সচিব স্বয়ং এলেন ওঁদের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বাড়িতে। লালচাঁদ তখন শয্যাশায়ী; কিন্তু কেউই তখন আশঙ্কা করেনি এ তাঁর মৃত্যুশয্যা। লালচাঁদ আমীরের প্রতিভূকে জানালেন, তাঁকে বলবেন, একটু ভাল হয়েই আমি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব। এ তো আমার সৌভাগ্য!

কিন্তু সে সুযোগ আর আসেনি তাঁর জীবনে। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিন নাবালক পুত্র আর বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রকে এ ধরাধামে রেখে একলা-চলার-পথে রওনা হয়ে পড়লেন একদিন।

নবীনচাঁদ সেই শূন্যগৃহে ঐ প্রকাণ্ড পিয়ানোটাকে দেখলেই বুকে একটা যন্ত্রণা বোধ করতেন। তাই ওঁর হিতৈষীরা শেষমেশ সেই পিয়ানোটাকে ওঁর চোখের আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিলেন—মণিরামপুরের বাগানবাড়িতে সেটিকে স্থানান্তরিত করা হল।

....দুনি আমাকে বলল, বাবার কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নবীনচাঁদ লালচাঁদের তিন নাবালক পুত্রকে—অর্থাৎ আমার বাবা-জ্যেষ্ঠাদের—নিম্নে ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে সেই মণিরামপুরে চলে যেতেন। তিন বালক পৌত্রের সামনে খুলে ফেলতেন সেই গ্র্যান্ড পিয়ানোর ঢাকাটা। বলতেন, বাজা দেখি, কেমন পারিস?

কিষণ, বিষণ, রাইচাঁদ—আট-দশ বছরের বালক—অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। বৃদ্ধ নবীনচাঁদ নিজেই টুংটাং করে শব্দ তুলতেন। এতকাল যিনি সঙ্গীতের ধারে-কাছে যেতেন না সেই বৃদ্ধের শেষ জীবনের সম্বল ছিল ঐ আঠাশখানি রেকর্ড। নাতিদের খেলতে পাঠিয়ে একাই বসতেন মণিরামপুরের বাগানবাড়িতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। রেকর্ড চড়াতেন গ্রামোফোনে। একা একা শুনতেন একমাত্র পুত্রের আর্তি:

আমার সাধ না মিটল আশা না পূরিল,

সকলি ফুরায়ে যায় মা।

আমি জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে

কোলে তুলে নিতে আয় মা।।

পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না

এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না,

যেথা আছে শুধু ভালো-বাসাবাসি

সেথা যেতে প্রাণচায় মা।।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে পারস্য গালিচায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতেন কোটিপতি বৃদ্ধ নবীনচাঁদ। কেউ জানতে পারত না।

সাত

দূর্লভচন্দ্রের পরিণত বয়সের একটি ঘটনার কথা এবার বলি :

ইদানিং তিনি আর বিশেষ গানের আসরে যান না। বয়স হয়েছে সত্তরের ওপর। নিজগৃহে আপন-মনে সঙ্গীত-সাধনা করেন, শিষ্যদের শেখান। এই সময়ে ঘটল একটি ঘটনা।

উত্তরখণ্ড থেকে কলকাতায় এলেন দুই দিগ্বিজয়ী সঙ্গীত-কেশরী। সবাই দুভাইকে উল্লেখ করে শিব-পশুপতিরূপে, যদিও পশুপতিসেবক মিশ্রই বড় ভাই—শিবসেবকের চেয়ে তিনি বছরতিনেকের বড়। দু-ভাই একসঙ্গে জুরি গান গাইতেন। দু-ভাই একটি বিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ ঘরানার উত্তরসাধক। তিনপুরুষে কাশী ও নেপালখণ্ডে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন। ওঁদের পিতামহ প্রমুখ মিশ্র একবার

মহারাজা পতিয়ালা দরবারে চল্লিশ-দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার আসরে নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়করূপে।

সেই শিব এবং পশুপতি এসেছেন কলকাতায়। কোনো এক সঙ্গীতের আসরে তাঁরা নাকি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন উপযুক্ত সঙ্গতকারের অভাবে তাঁরা তাঁদের কলাকৌশল সম্যক দেখাতে পারছেন না। বস্তুত সেদিন নাকি সেই সঙ্গতের আসরে নামকরা মৃদঙ্গবাদক কেউ উপস্থিত ছিলেন না—যাঁরা ছিলেন তাঁদের অপদস্থ করতে দু-ভাই ইচ্ছা করেই ‘সম’ পরিষ্কার করে দেখাচ্ছিলেন না; কখনো নয় মাত্রায় কখনো এগারো মাত্রায় এমন করে ছাড়ছেন যে মাদঙ্গিক তালকানা হয়ে যাচ্ছিল। অথচ শাস্ত্রসম্মত বিচারে গায়ক যে বেতালা হচ্ছেন এমন কথা বলা যায় না, লয়ের হিসাবে তাঁদের ভুল ছিল না। ইচ্ছা করে এভাবে বাদককে অপ্রস্তুত করে দু-ভাই সবিনয়ে আহ্বায়ককে বলেছিলেন, কলকাতায় ভাল সঙ্গতকার নেই একথা কেন আগে জানালেন না বাবুজী, আমরা মাদঙ্গিক সঙ্গে করে আনতাম।

বলাবাহুল্য অনেকেই ক্ষুব্ধ, অপমানিত হলেন। আসরের পরে তাঁরা যুক্তি করলেন—ঐ দুই সঙ্গীত-কেশরীর গর্ব খর্ব করতে হবে। তাঁরা তিন-চারজনে স্থির করলেন পরবর্তী আসরে তাঁরা এমন একজন মৃদঙ্গ-বাদককে সঙ্গত করতে বসাবেন যাঁর সঙ্গে তাল রাখতে ওরাই হিমসিম খেয়ে যাবে। সবাই একবাক্যে বললেন, একাজ সম্পন্ন করবার মতো শিক্ষা আছে একজনেরই—শিবনারায়ণ দাস লেনের বৃদ্ধ মাদঙ্গিক দুর্লভচন্দ্র। ওঁরা সদলবলে এসে হাজির হলেন বৃদ্ধের দরবারে।

সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যন্ত শুনে ভট্টাচার্যমশাই বললেন, আমাকে মার্জনা করতে হবে বাবাসকল। আমি টুলো-পণ্ডিত—যজন-যাজন করি, চাল কলা-নেবেদ্য খাই, আমি লড়াই করতে পারব না। মাদঙ্গিক হিসাবে গায়ককে ছাপিয়ে যাওয়ার শিক্ষা আমি পাইনি। তেমন গুরুর কাছে ‘নাড়া’ বাঁধিনি আমি।

ওঁরা বললেন, তার মানে আপনি বলতে চান, কলকাতার মাথা হেঁট হল কি হল না তাতে আপনার কিছু যায় আসে না!

—না। তা বলিনি আমি। আমি বলতে চাই—সঙ্গীতের আসর কোনো দ্বৈরথ রণাঙ্গন নয়। বাদক আর গায়ক প্রতিযোগী নয়, তারা সহযোগী। একে অপরকে ছাপিয়ে যাবে না, একে অপরকে অনুসরণ করবে। দু’জনের যৌথ প্রচেষ্টায় রাগরূপ মূর্ত হয়ে উঠবে—প্রকৃতি ও পুরুষ যেভাবে সহযোগিতার দ্বন্দ্ব নতুন সৃষ্টিতে মাতে। বুঝলে? ‘দ্বন্দ্ব’-শব্দটির দুটি অর্থ আছে। যে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বসমাসের দ্বন্দ্ব তাকেই মানি আমি! দ্বন্দ্ব মানে লড়াই নয়।

সঙ্গীত-সাধকের এ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ‘দ্বন্দ্ব-সমাসে’ ওঁরা তুষ্ট হলেন না। ওঁরা যে প্রথম দিনেই বুঝে নিয়েছেন বহিরাগত সঙ্গীত-অভিমানীদ্বয় সঙ্গীত-সাধক নয়, রাজসিক গীতযোদ্ধা। ‘দ্বন্দ্ব’ তাদের কাছে বিপরীত অর্থবহ, অনর্থবহ। তবু কিছুতেই বৃদ্ধকে রাজি করানো গেল না।

উপায়ান্তর হয়ে ওঁরা উপস্থিত হলেন আর একজন প্রখ্যাত মাদঙ্গিকের কাছে—বিখ্যাত সুরকার দেবচন্দ্র বাগচীর ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশচন্দ্রের কাছে। তিনি বললেন, পূর্বদিন আসরে আমিও ছিলাম। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি—শিব ও পশুপতি অন্যায্য স্পর্ধা প্রকাশ করে কলকাতার সঙ্গীত-সমাজকে অপমান করেছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতে রাজি আছি; কিন্তু আসরে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিচারকদের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাঁরা বিচার করে রায় দেবেন—ক্রটি কার, গায়কের না বাদকের।

সেইমতোই ব্যবস্থা হল। কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের ভারত সঙ্গীত সমাজে আয়োজন করা হল জলসা। সঙ্গীতাচার্য বিশ্বনাথ রাও এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বসলেন বিচারকের আসনে। বহু সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত আছেন সভায় এবং এসে বসেছেন পাখোয়াজ-রাজ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তালাধ্যায়ের গুরু দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য।

গান শুরু করলেন শিব-পশুপতি। জুড়িতে তাঁদের আলাপচারীর পর্যায় নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু চৌতালে গান আরম্ভ হতেই গণ্ডগোল শুরু হল। প্রথম আবর্তের শেষে সতীশচন্দ্র যেই পাখোয়াজে ‘ধা’ মারলেন অমনি একযোগে দু-ভাই বলে উঠলেন, এ ক্যা হয়! বাবুজীকা ‘ধা’ তো মোকামমে পৌঁছতাই নহি!

সতীশচন্দ্র শান্ত নির্বিরোধী স্বভাবের মানুষ। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ‘ধা’ ঠিক মোকামেই

পৌঁছেছে।' গায়করা তা মানতে রাজি নন। তখন 'ধা' নিয়ে যে ধাঁধার সৃষ্টি হল তার আর সমাধান হয় না! ক্রমে শুধু শিল্পীদের মধ্যে নয়, শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যেও মতান্তর থেকে মনান্তর শুরু হয়ে গেল। সতীশচন্দ্র বারে বারে বিচারকদ্বয়ের দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা কোনো মতামত দিচ্ছেন না—নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন।

ওদিকে মনান্তর থেকে রীতিমত বচসা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

তখন নগেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, সতীশবাবুর সঙ্গত শাস্ত্রানুসারে নির্ভুল হয়েছে। বাংলাদেশের এই রীতি সর্বজনস্বীকৃত। কানীর শিউসহায় মিশ্র, কান্তাপ্রসাদ প্রভৃতি বড় বড় ধ্রুপদীরা এই রীতিতেই গেয়ে গিয়েছেন, কোনদিন কেউ প্রতিবাদ করেননি।

পশুপতি ও শিবও তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা বললেন, আমরা নেপাল দরবারে, কানীতে বড় বড় আসরে যে রীতিতে গেয়েছি সেই প্রথা অনুসারেই এখানে গাইছি। আইয়ে না আপ্ হম দোনা সম্-বিসম-অনাঘাত দেখা দুঙ্গা! বাবুজিকা ঠেকামে গলদ্ হ্যায়।

সতীশচন্দ্র দুর্লভকে বললেন, বিচারকরা তো কিছু বলছেন না, আপনি কিছু বলুন?

বুদ্ধ বললেন, আমি আর কী বলব বাবা সতীশ? ওঁরা তো গান গাইতে আসেননি, এসেছেন লড়াই করতে। তা আমি বুড়োমানুষ.....

কথাটা তাঁর শেষ হল না। ওদিকে কলহ ও গোলমাল তখন চরম পর্যায়ে উঠেছে। একদল শ্রোতা পাখোয়াজীর প্রতি অপমানকর একটি বাক্য শুনিতে দিলেন। তখনই কয়েকজন আস্তিন গোটালেন। বোঝা গেল তর্কটা হাতাহাতিতে নিষ্পন্ন হবে।

একটা পালাও-পালাও রব উঠল।

ঠিক তখনই ঘটল একটা ঘটনা। মল্লভূমের মাঝখানে লাফ এসে দাঁড়ালেন এক বিরাটদেহী ব্যক্তি। হুংকার দিয়ে উঠলেন : এটা হচ্ছে কী?

মুহূর্তের নীরবতা। দীর্ঘদেহী বললেন, আমি জানতে চাই, এটা গানের আসর না লড়াইয়ের আখড়া? এ্যা?

কেউ জবাব দেয় না। তিনি আবার বলেন, জবাব দিলেন না কেউ দেখছি। শুনুন, দু-রকম ব্যবস্থাই আছে। যাঁরা গান শুনতে চান বসে পড়ুন, আর যাঁরা লড়াই করতে চান তাঁরা আসর ছেড়ে আমার সঙ্গে ঐ মাঠে এগিয়ে আসুন।

সভায় তখন সূচীভেদ্য নিম্ভরুতা। গুটিগুটি সবাই একে একে বসে পড়ছে।

শিবা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে বলেন, ইয়ে কোন হ্যায় জী?

—যতীন্দ্রচরণ গুহ! তবে সে নামে কেউ ওঁকে চেনে না। ওঁর ডাকনাম 'গোবরবাবু'। লাইট-ওয়েট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর! আমেরিকা থেকে জিতে ফিরেছেন।

গোবরবাবু শিবা-পশুপতির দিকে ফিরে বললেন, আপ্ শুরু কিজিয়ে ফিন! ম্যয় খাড়া হুঁ। ম্যয় দেখ লুঙ্গা কি 'ধা' ঠিক ঠিক মোকামমে পৌঁছে যায়!

ভয়ে ভয়ে শুরু করলেন দু'জন চৌতালে। সতীশচন্দ্র সঙ্গত শুরু করলেন। মাজায় হাত দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লাইট-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান গোবরবাবু। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে শিবা-পশুপতি স্বীকার করলেন 'ধা' এখন ঠিক মতো মোকামে পৌঁছে যাচ্ছে।

অর্থাৎ রন্দা মারার প্রয়োজন নেই।

আট

কিন্তু এভাবে কুস্তিগীরের পাহারায় তো সঙ্গীতের আসর হয় না।

আবার কিছুদিন পরের কথা। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সঙ্গীত-সমাজে আবার আসর বসেছে। সেবারও দুর্লভচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করতে এলেন কয়েকজন। যেদিন আসর হবে সেদিনই সকালবেলা ওঁরা এলেন শিবনারায়ণ দাস লেনে।

দুর্লভচন্দ্র তখন নামাবলী গায়ে, মাথায় গামছা জড়িয়ে যজ্ঞমানের বাড়ি চলেছেন। পথের মাঝেই দেখা হল। ওঁরা বললেন, সেবার আপনি বাজাতে রাজি হননি। এবার কি আপনি রাজি হবেন?

দুর্লভচন্দ্র বললেন, না। ওঁরা যে রীতিতে গাইছেন সেই রীতিতেও আমি বাজাতে পারি; কিন্তু বাজাব না। ওঁরা গান গাইতে আসেননি, এসেছেন ওস্তাদী দেখাতে। ওর মধ্যে আমি নেই।

—বেশ! না বাজান, নাই বাজালেন। আসরে উপস্থিত থাকবেন কি?

—আমি তো এখন পুজো করতে যাচ্ছি বাবাসকল। পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত উপবাসী থাকি। সন্ধ্যাবেলায় একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। বুঝতেই তো পার। বয়স তো কম হল না।

এঁরা কিন্তু নাছোড়বান্দা—সে হবে না ভট্টাচার্য মশাই। আপনাকে বাজাতে তো আর হচ্ছে না। আসতে আপনাকে হবেই। আমরা এসে গাড়ি করে নিয়ে যাব।

দুর্লভ বললেন, গাড়ি-ফাড়ি লাগবে না। ঠিক আছে, পূজা সেরে আমি সোজা যজমানের বাড়ি থেকেই আসরে চলে যাব।

*

*

*

সন্ধ্যার পর আসর শুরু হল। আসরে প্রবেশ করলেন উপবাসী দুর্লভচন্দ্র। উর্ধ্বাঙ্গে একটি উত্তরীয়, বেলের আঠায় মাজা ঋগ্বেদী পৈতেটা তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। উত্তরীয়ের তলায় কোনো পিরান নেই। ক্রমধ্যে যজ্ঞভস্মের ত্রিপুঙ্জক। উনি যখন আসরে প্রবেশ করলেন তখন সেখানে তিলধারণের ঠাই নেই। ভূকৈলাসের বড়তরফের কর্তা ওঁকে দেখতে পেয়ে আহ্বান করেন, আসুন, আসুন, ভট্টাচার্য মশাই—এগিয়ে এসে বসুন। অনেকদিন পর পদধূলি দিলেন।

অনেকেই ব্রাহ্মণের পদধূলি নিলেন। বৃদ্ধ বসে পড়লেন আসরের সামনের দিকে। শিবসেবক ও পশুপতিসেবক দুই ভাই বসেছেন আসরের কেন্দ্রবিন্দুতে। মাথার ওপরে জ্বলছে দুটি ন-মুখো কারবাইড গ্যাসের ঝাড়। দুজনেরই দরবারী সাজসজ্জা। উর্ধ্বাঙ্গে সিন্ধের পাঞ্জাবী, পাঁচ-আঙুলে পাঁচটি করে রত্নাসুরীয়। কে একজন তাঁদের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিল—ইনিই বিখ্যাত মাদঙ্গিক শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য। মুরারীমোহনবাবুর শিষ্য।

দুই-ভাই জোড়াতালি দেওয়া নমস্কার ঠুকে দিলেন। শিবপ্রসাদ বললেন, মুরারীবাবুকে নাম সুন্য হয় হম দোনো।

যেন, দুর্লভচন্দ্রের নাম শোনার প্রশ্নই ওঠে না।

শুরু হল গান। সংক্ষেপে আলাপচারী সেরে গান আরম্ভ করলেন। দুর্লভেরই এক শিষ্য সঙ্গত করছিলেন। মিনিট দুই-তিন পরেই দেখা গেল গায়ক বিরক্তি প্রকাশ করছেন। গান থামিয়ে সঙ্গতকারীকে তাল বুঝিয়ে দিচ্ছেন—কী তাল, কী বোল! কিন্তু বারেরবারেই তাঁরা বিরক্তি প্রকাশ করছেন। মাদঙ্গিক গলদঘর্ম হয়ে পড়ছেন ক্রমশ। আসর আর জমছে না। শিবা বললেন, বাবুজী, আপ শ্রেফ ঠেকা দেতে চলিয়ে—বজানেকা কোই জরুরং নেহি।

হঠাৎ নাসারঞ্জ দুটি ফুলে উঠল উপবাসী ব্রাহ্মণের। চোখ দুটি ধব্ব করে জ্বলে উঠল। বিনা-বাক্যব্যয়ে তুলে নিলেন মৃদঙ্গটা শিষ্যের হাত থেকে। বললেন, নাও, তোমরা ফিরে ফিস্তিসে শুরু কর।

দুর্লভচন্দ্রের হিন্দী শুনে হেসে ফেলেছে গায়ক। তৎক্ষণাৎ কিন্তু গান শুরু করল ওরা।

বারাণসীর এই মিশ্র-ঘরানা তালাধ্যায়ে ভারতের প্রায় শীর্ষস্থানীয়। তার মধ্যে এই দুই ভাইয়ের এক তির্যক বিলাস তাল-লয়ের কূট কৌশলে সঙ্গতকারীকে খেঁজছে করে আত্মসমুগ্ধ হওয়া। দুর্লভচন্দ্র যখন মেরুদণ্ড সোজা করে মৃদঙ্গ ক্রোড়ে বসলেন তখন ওরা নতুন করে গান শুরু করল। তালাধ্যায়ের সম্রাট দুর্লভচন্দ্র অচিরে বুঝে ফেললেন গায়ক ইচ্ছা কব্বে ‘সম’ পরিষ্কার করে দেখাচ্ছেন না। এক-একবার এক-এক স্থানে ছাড়ছেন—কখনও নয় মাত্রায়, কখনও এগারো মাত্রায়। এটা নিশ্চয় রীতিবহির্ভূত, কিন্তু ব্যাকরণ-বহির্ভূত তাকে বলা চলে না। অঙ্কের হিসাবে লয়ের সংস্থাপন ত্রুটিহীন। দুর্লভচন্দ্রও চুলচেরা হিসাবে ঠিক-ঠিক জায়গায় ‘ধা’ মারতে লাগলেন।

গায়ক বুঝলেন, ফাঁকচালে এ দাবাড়ুকে মাং করা যাবে না—তাই শুরু করলেন গতির প্রতিযোগিতা। তারপর দীর্ঘ দেড়ঘণ্টাকাল সঙ্গীত ও সঙ্গতের এক দুরন্ত সার্কাস! যেন ট্র্যাপিজের খেলা। গায়ক মাদঙ্গিককে বার বার শূন্যে নিক্ষিপ্ত করছেন, আর বাদক মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ সমের মাথায় ধরে ফেলছেন অপরদিকের রজ্জু—সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে দিচ্ছেন—‘ধা’! বাগেশ্রী আলাপের

বাগিচাও নেই, শ্রী-ও নেই—শ্রোতৃদল যেন আসরে গান শুনতে আসেননি, তাঁরা যেন উর্ধ্বমুখ দর্শক—ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের কখন পদস্থলন হয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

সে কী কসরৎ! দ্রুত-অতিদ্রুত আরও দ্রুত তেহাই চলেছে—কিন্তু ‘ধা’ মোকাম ছেড়ে একতিল সরছে না! কণ্ঠ কোনোক্রমেই যন্ত্রকে অতিক্রম করতে পারল না। মৃদঙ্গ যেন দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম্-দ্রিম্ বোল তুলে গায়ককে বলছে : ছোট, ছোট আরও জোরে, আরও-আরও জোরে—তা বলে আমাকে পেছনে ফেলতে পারবে না, আমি তোমার কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সাথে সাথে আছি।

শেষ সময়ে এসে খামল সঙ্গীত। ঠিক খণ্ডমুহূর্তে বোল তুলে মৃদঙ্গও স্তব্ধ হল।

পকেট থেকে সুগন্ধী রেশমী রুমাল বার করে শিবা-পশুপতি তখন কপালের ঘাম মুছছেন।

দুর্লভ তাঁর পাখোয়াজটি ফরাশের ওপর নামিয়ে রেখে কাশীর মিশ্রভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন করে তাঁর নিজস্ব খাজা-হিন্দীতে বললেন : কী বাবা ব্রৈরাশিক-ভগ্নাংশ কখনেবালা! তোমাদের কড়াক্রান্তির হিসাব ঠিক ঠিক ট্যাক্কে উঠা হয় তো? অঙ্ককা ক্লাস খতম?

দু-ভাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না বৃদ্ধ কী বলছেন।

—মগজ্জে স্যাঁদায়া নেই? শোন বাবা জোড়া-বলিবর্দ! বাগেশ্রী রাগ নয়, যা শোনাতে তাকে বলতে পারা ‘বাঘের বিশ্রি বদরাগ’! সঙ্গীতের চাঁপাকলা দে-কে যত ইচ্ছে বাঘের বিশ্রি পিণ্ডি চটকাও—হাম থোড়াই কেয়ার কর্তা। সমঝা?

কথা না বুঝলেও সায়িক ব্রাহ্মণের ধমকের সুরটুকু ওঁরা বুঝে নিয়েছিলেন। যুক্তকরে অকূঠ স্বীকৃতি দিলেন নিজ অপরাধের—প্রকাশ্য আসরে। বললেন, হাম্ দোনোকে কসুর মাফি কিয়া যায় পণ্ডিতজী। হ্যাঁ—অব্ হম্ মান্ লী কি কলকাতামে ভি হ্যায় এক উস্তাদ!

তবু রাগ পড়ল না বৃদ্ধের। বললেন, শালুক চিন্তে পারা হ্যায় গোপালঠাকুর! তোদের ‘ওস্তাদী’ খেতাব ছাড়া আমার ভাত হজম নেহি হোতা, না? তোদের ওস্তাদীতে হম্ ‘ইয়ে’ করতা! সমঝা?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওরা। দুর্লভচন্দ্র তখন শিষ্যের দিকে ফিরে বলেন, ও সতীশ, এঁদের বুঝিয়ে দাও তো ব্যাপারটা। হিন্দী আমার আসে না।

শিবা-পশুপতি সতীশচন্দ্রের দিকে ফিরে বলে, হ্যাঁ, কহিয়ে তো? ক্যা বোলা পণ্ডিতজীনে?

সতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান। পশ্চিমে বহুদিন ছিলেন! বাগেশ্রীর পিণ্ডি চটকানোর প্রশঙ্গ এড়িয়ে বললেন, পণ্ডিতজীনে কথা কী গানা তো আপ দোনো আচ্ছাই গায়া হ্যায়, লেকিন বাৎচিটোঁমে তো গলদ হ্যায় জরুর।

—কৈও? কেয়া কসুর হুয়া হমকো?

—সোচিয়ে না—‘কসুর’ কা ক্যা সওয়াল? আপ্ ভি গানা নেহী গাতে, ম্যায়ভি বজানা নেহি বজাতা। হম্-দোনো তো স্রিফ্ যস্তর হ্যায় উস্তাদজী! গানেওয়ালী ওঁর বাজানেওয়ালী তো ছিপাকে বৈঠি হ্যায়—উনকি তো দেখাই ন যাতি!

* নাটমন্দিরের অপরপ্রান্তে মৃন্ময়ী প্রতিমার দিকে হাত তুলে দেখান সতীশচন্দ্র।

শিবা-পশুপতিকে দ্বিতীয়বার স্বীকার করতে হল তাঁদের কসুর। বটেই তো! শুধু মৃদঙ্গটাই তো নয়—মৃদঙ্গবাদকও যন্ত্র, গায়কও যন্ত্র,—যন্ত্রী আছেন অলক্ষ্যে!

নয়

মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র যে-কালের মানুষ সেই কালকে আমি দেখিনি, যে-জগতের মানুষ সেই জগতের সম্বন্ধে আমার কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। অভিধানের বাইরে মৃদঙ্গ যন্ত্রটাকেই বা কবার দেখেছি? নিতান্ত ঘটনাক্রমে তাঁর জীবন-ইতিহাস সন্ধান করতে বসেছিলাম—লাভ বৈ লোকসান হয়নি তাতে। ধ্রুপদ-ধামার আজ প্রায় ডোডোপাখীর সমগোত্রীয়। বৎসরান্তে কোনো কোনো মার্গসঙ্গীতের সম্মেলনীতে দেখি জনমণ্ডলীর এক অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এখনও এই ক্ষীয়মাণ সঙ্গীতধারায় তৃষণ মেটাতে আসেন। তাহলে সেই উজাড়-হয়ে-যাওয়া সঙ্গীত-পাগলদের নিয়ে আজ কেন আলোচনা করছি? তার কারণ এ নয় যে, লালচাঁদ গ্রামোফোন কোম্পানীর ব্যালেন্স-শীটকে পালটে লিখেছিলেন, তার কারণ এ নয় যে ‘অমৃতনাথ’ সর্বভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তার কারণ এ নয় যে

দুর্লভচন্দ্র কোনো গর্বোদ্ধত পণ্ডিতস্বাম্যের দর্পচূর্ণ করে কলকাতার সঙ্গীতসমাজকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তার কারণ এই যে, এঁরা সংসারের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সুরের তরণী বেয়ে অধরাকে ধরতে বেরিয়েছিলেন, তার কারণ এই যে, জাগতিক লাভ-ক্ষতির বিচার না করে এঁরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াতীত লাভ করবার অতন্দ্র-সাধনায় একনিষ্ঠ ছিলেন। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তাঁদের সেই নিরলস ধ্যানের সাধনাকেই আমরা প্রণতি জানাই।

*

*

*

মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্রের জীবন যেমন বিশ্বয়ের তাঁর জীবনাবসানটিও তেমনি অদ্ভুত। বস্তুত বাস্তব জীবন-কাহিনী বর্ণনা না করে আমি যদি এখানে মন-গড়া গল্পকথা লিখতে বসতাম, তাহলে এই শেষ দৃশ্যটি রচনা করার পূর্বে হয়তো নিজেই থমকে যেতাম। ভেবে দেখতাম—পাঠক আমাকে অতি-নাটকীয়তা দোষে অভিযুক্ত করবেন কি না। মহাকাল অতি-নাটকীয়তাকে খোড়াই কেয়ার করেন! তাই পার্থিব নাট্যকার যেখানে সশঙ্ক-সঞ্চারী, মহাকাল সেখানে অনায়াস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেন। সেই মহানাট্যকার দুর্লভ-নাটকের শেষদৃশ্যের পরিকল্পনা করলেন পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতদরদী এবং অল বেঙ্গল-মিউজিক কনফারেন্সের স্রষ্টা ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ মশায়ের অট্টালিকায়। তারিখটা : ২৪ শে আশ্বিন ১৯৩৮।

ঝাড়-লঠন, দেওয়ালগিরি, খাশ-গেলাসের কাল গিয়েছে—এসেছে বিদ্যুৎ। বহুদিন পরে বিরাট আয়োজন করেছেন ঘোষমশাই। কলকাতার তো বটেই, দেশ-দেশান্তরের যাবতীয় সঙ্গীতাচার্য সমবেত হয়েছেন সে আসরে। আসছেন বিখ্যাত পাখোয়াজী শঙ্কররাও ওস্তাদ, গৌরচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর, ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অযোধ্যারাম পাঠক। নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়ও আসছেন। যথারীতি আমন্ত্রণ পেলেন ভট্টাচার্য-মশাই। তখন তিনি ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ। ইদানীং আর সঙ্গীতের আসরে যান না; জরাগ্রস্ত হাত দুটি এবার বিদায় চাইছে! শিষ্যরা এখনও আসে, গান-বাজনার আসর বসে নিজের ভদ্রাসনেই। উনি বাজান না, শোনেন। কিন্তু এমন একটি আসরে যাবার নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারেন তিনি? পরিবারস্থ সবাই বারণ করেছিল, উনি শোনেননি।

বহুদিন পরে মৃদঙ্গাচার্য ‘দুলীবাবু’কে দেখে সে-আমলের সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। নবীনযুগের অনেক সঙ্গত-দরদী আছেন, যাঁরা দুর্লভচন্দ্রের সুখ্যাতিই শুনেছেন, বাজনা শোনেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ওঁকে অনুরোধ করল একটু হাত খেলাতে—ওঁর আঙুলগুলোও নিশাপিশ করছিল—কিন্তু শিষ্যেরা রাজি হলেন না।

*

*

*

রাত্রির মধ্যযাম। আলাপ শুরু করলেন তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। ললিত হলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীশিষ্য মহীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র। ললিত শুরু করলেন মিয়া-কি-মল্‌হারে—‘হে আদি অদ্ভু!’ উস্তাদোঁ কি উস্তাদ মীর মহম্মদ গাজি মিয়া তানসেনজীর প্রিয় রাগিণী। আর স্থির থাকতে পারলেন না দুর্লভচন্দ্র! পার্শ্ববর্তী শিষ্যের হাত থেকে যেন ছিনিয়ে নিলেন মৃদঙ্গটা। পরিচিত হাতের স্পর্শ পেয়ে মৃদঙ্গ শিউরে উঠল—‘ধা’!

একটা হর্যোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ আসরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঢেউ তুলেই মিলিয়ে গেল। যেমন রাগ, তেমনি গায়ক, তেমনি বাদক। জবাব নেই! চৌতালে বোল তুলে মৃদঙ্গ ছুটেতে শুরু করল গায়কের পিছু-পিছু—তেহাইয়ের ঘুলঘুলিয়ায় যেন দ্রুতছন্দে নৃপুর-ঝংকৃত চরণের লুকোচুরি। ক্রমে দ্রিমিদ্‌রিমি বোলের ভেতরেই হল মেঘসঞ্চার—চন্দ্রাতপে ঘেরা আলোকোজ্জ্বল আসর যেন ভাবরাজ্যের জলদবিস্তারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—যেন আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে পুষ্করবংশাবতংসের আবির্ভাব ঘটল আসরে! ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক। ধারা শ্রাবণে সুরের ধারায় ভেসে গেলেন সবাই! নবীন সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রবীণ মাদার্সিক একই খণ্ড-মুহুর্তে এসে পৌঁছিলেন শেষতীর্থে! সমস্ত আসর হা-হা করে মাথা ঝাঁকালো সমের মাথায়।

কেউ জানতে পারেনি। কেউ নজর করেনি। জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণের স্নায়ুতন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার বাজতে শুরু

করেছে তা মল্‌হার নয়—দীপক! বৃদ্ধের রগের শিরা—দুটি ফেটে পড়বার উপক্রম করছে। ললিতবাবু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধূলি মাথায় নিয়ে বললেন, আজ আমার জন্ম সার্থক।

বৃদ্ধ আশীর্বাদ করলেন দু-হাত তুলে। ললিতের হাত—দুটি ধরে কানে কানে বললেন—যেন অত্যন্ত গোপন কথা : ললিত, তুমি পেয়েছ!

‘ললিত, তুমি পেয়েছ!’—ব্যস্, আর কিছু নয়! তবু দু-চোখ জলে ভরে এল ললিতের। দুটি হাত জোড় করে বললেন, তাহলে আমাকে আশীর্বাদ করুন! আমার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করুন।

—বল ললিত, বল—কী চাও? আজ আমি দাতাকর্ণ!

—দরবারী কানাড়া ধরব এবার। আপনাকে সঙ্গত করতে হবে।

নামিয়ে রাখা মৃদঙ্গটা কোলে তুলে নিলেন আবার—যেন বীণকার নারদের সঙ্গে সঙ্গত করতে বসলেন আদি-মাদঙ্গিক লম্বোদর গজানন!

গভীর নিশীথ। সমস্ত আসর তন্ময়। শুরু হল ওস্তাদের মার—মেজাজী রাগ, সুর ফাঁকতালে দরবারী কানাড়া : বাজত বাঁঝ মৃদঙ্গ!

নীল শিরাওঠা দুটি লোলচর্ম হাত নতুন করে বোল তুলল মৃদঙ্গে। সঙ্গীত দ্রুতলয়ে ছুটছে সুরলোকের শিখর থেকে শিখরে—লাফে লাফে লাফিয়ে উঠছে, যেন রক্তচাপ যন্ত্রে পারদ-সঞ্চেত। উপমা নয়, বাস্তবেই তা উঠছিল অলক্ষ্যে—কেউ জানতে পারেনি, কেউ নজর করেনি।

সাতটি সুর সাতটি পোষা পাখির মতো ডাকছে নবীন-যুগের গায়ক ললিতমোহনের কণ্ঠে—যেন উদয়-ভানুর সাতটি রঙের বর্ণালী। জবাবে বলিরেখাক্ত দশটি আঙুল মৃদঙ্গের মঞ্চভূমে নৃত্যের তালে তালে বোল তুলে ছুটে চলেছে—যেন অন্তসূর্যের শেষ রক্তিম আশীর্বাদ! সারা আসর তন্ময় হয়ে গিয়েছে, ‘বুঁদ’ হয়ে গিয়েছে, ‘ভৌ’ হয়ে গিয়েছে, ‘না’ হয়ে গিয়েছে!

হঠাৎ, যাঁরা সামনের দিকে বসেছিলেন তাঁদের লক্ষ হল—ভট্টাচার্যমশাই শুধু বাঁ হাতে বাজাচ্ছেন! ডান-হাত স্থির হয়ে গিয়েছে। কেন? এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, দুর্লভচন্দ্রের দক্ষিণাঙ্গ তখন সম্পূর্ণ বিবশ হয়ে গিয়েছে—পক্ষাঘাতের নিষ্ঠুর আক্রমণে। অসীম যন্ত্রণা সর্বদেহ দিয়ে সহ্য করছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—শুধু পাছে তাল কাটে, পাছে আঁচড় লাগে সুরলক্ষ্মীর গায়ে তাই সেই দৈহিক যন্ত্রণাকে মনোবলে অস্বীকার করে একহাতে ঠেকা দিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ নজর পড়ল গায়কের। বললেন—এ কী?

পরমুহূর্তেই অস্তিম শয়নে ঢলে পড়লেন মৃদঙ্গাচার্য। যেন শেষ প্রণতি জানাচ্ছেন সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। আমরা হলে বলতুম, করোনারি থ্রোসিস। ওঁরা বললেন, সন্ধ্যা!

ঝুঁকে পড়লেন ললিতবাবু : কষ্ট হচ্ছে?

মৃত্যুর শেষ-সীমান্ত থেকে সাড়া দিলেন দুর্লভচন্দ্র। কথা বললেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন, থেম না!

অনুরোধ নয়! আদেশ!

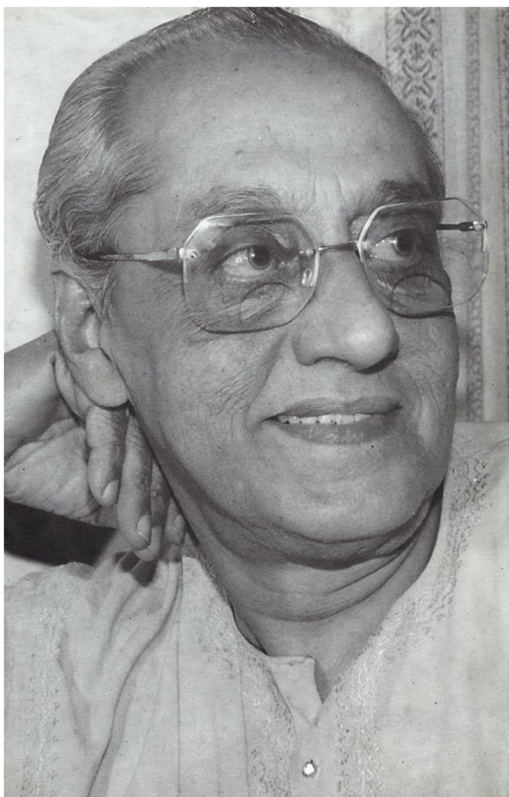
থামতে পারলেন না ললিতমোহন। গাইলেন শেষ কলি : বাজত বাঁঝ মৃদঙ্গ!

মৃদঙ্গ তখন বাজছে না কিন্তু। থেমে গিয়েছে!

থেমেছে কি? দুলিবাবুর ক্রোড়চ্যুত আজন্মসাথী সেই যন্ত্রটা—সেই ‘মুৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার’—সে থামেনি। সে অক্ষুটস্বরে বলছে : Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter! Therefore, ye soft Pipes! Play on!

সঙ্গীত-সাধকের এমন মৃত্যুই একান্ত কাম্য—কী বলেন? এমন মৃত্যুই তাঁকে করে তোলে মৃত্যুঞ্জয়ী। এর চেয়ে বড় সম্মান কোন শিল্পী কবে কামনা করেছেন? কীটস-এর ভাষায় : Let me have music dying and I seek no more delight!

(পঞ্চাশোদর্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)



দুর্লভ 'দুর্লভ'
নারায়ণ সান্যাল